

লাভ ও পরিশ্রমে এ জগতে কোন ভাল কাজই সাধন করিবার শক্তি হয় না। সুতরাং কেবল অতি বিদ্যাবতী, জ্ঞানবতী ও শ্রমরতা নারীরাই উচ্চ শিক্ষার পক্ষে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত। আমাদের আরও মনে রাখা উচিত যে, ইচ্ছা ও সুবিধা থাকিলে প্রত্যেক জীলোকই বিদ্যাবতী ও জ্ঞানবতী হইতে পারেন। আমরা বাল্যকাল হইতে নিজেকে যেভাবে প্রস্তুত করি, বয়সকালে সেইরূপই হই। শৈশবে ও বাল্যে যদি আমরা একাগ্রচিত্তে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জনে অভ্যস্ত হই, তাহা হইলে পরিণত বয়সে আমরা নিশ্চয়ই জ্ঞানবতী, সুশিক্ষিতা নারী হইব। কিন্তু তাহার পরিবর্তে আমাদের বাল্যজীবন যদি কেবল পুতুলখেলা ও নানারূপ কুসংস্কারের মধ্যে অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে যৌবনে আমরা এক এক জন অলস, নিদ্রাপ্রিয় ও অজ্ঞ জীলোক হইয়া উঠিব।

স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হওয়া বড় সহজ কাজ নয়। উহার অল্প জ্ঞান ও বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বলেরও একান্ত আবশ্যক। অনেক সময় উহাতে এত খাটিতে হয় ও বকিয়া বকিয়া এত বিরক্তি ধরে যে, এইরূপে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা উপার্জন অতি কষ্টকর হইয়া উঠে। তাহা

ছাড়া, উহাতে কণ্ঠ করিবার ক্ষমতা ও বৈধর্মের আবশ্যক। কিন্তু একদিক দিয়া দেখিলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ যেমন অতিশয় বিরক্তিজনক, আমোদ-আহ্লাদ-শূন্য, এবং মনের শূন্যতা ও শরীরের বলনাশক বলিয়া বোধ হয়, অল্প দিক দিয়া দেখিলে উহা তেমনি একটা মহৎ কাজ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা দ্বারা আমরা কি কাটাঘন, কি মক্কুনি, কি কঙ্করময় প্রদেশ, সর্বত্রই বীজ বপন করি।

তবে এই বীজ হইতে কখন কি প্রকার ফল ফলিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। বিশেষতঃ, অল্পকৈ জ্ঞান স্বর্গের প্রভাব বুঝাইবার সুযোগ শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। শিক্ষয়িত্রী যদি বর ও পরিশ্রমের সহিত নিজের কৰ্ত্তব্য উত্তমরূপে সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষা দ্বারা কত সুপ্রগতি উৎপাদিত ও চরিত্র উন্নত হইয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। উহার উপর তিনি নিজ জ্ঞানবলে এই জীবিকার উপায়কে যখন উচ্চ কৰ্ত্তব্য কাজ করিয়া ভুলিতে পারিবেন, তখন এই সাধন তাঁহার স্বর্গের সোপান স্বরূপ হইয়া ক্রমে তাঁহাকে স্বর্গের নিকটবর্তী করিবে।

(ক্রমশঃ)



ব্রাহ্মসমাজের নিকট আমাদের স্বাগত।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের আরও কয়েকটা উন্নতির জন্য ব্রাহ্মসমাজের কাছে আমরা বিশেষরূপে স্বাগত। এখানে সংক্ষেপে সেইগুলির উল্লেখ করিব।

শ্রীশিক্ষা—ইহার অপক্ষে হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহাই থাকুক, কাগ্যাতঃ শ্রীজ্ঞাতির প্রতি জনসাধারণের অধিক আদর ছিল না এবং এখনও নাই। শ্রীলোকদের যে লেখাপড়া শিক্ষা আবশ্যক, এ কথা সকল শিক্ষাভ্রমণী ব্যক্তিও স্বীকার করেন বলিয়া মনে হয় না। সমাজের সর্বস্বাধীন উন্নতির পক্ষে কি শ্রীলোক, কি পুরুষ, সকলেরই যতদূর সম্ভব দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিতান্ত আবশ্যক, ইহা যে ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারি নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করিতে ব্রাহ্মসমাজই প্রথম অগ্রসর হন। সমাজ ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের পথ অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও তাহা অনেকটা দূরে রহিয়াছে। বিশিষ্ট শ্রীশিক্ষার বহুল প্রচারের এখনও অনেক বিলম্ব। যাহা কিছু হইতেছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্মদের দেবাদেশি। দেশে যে কয়টা ত্রীধর্মের সহিত সম্পর্কহীন উচ্চতর বাণিকা-বিদ্যালয় আছে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট।

অবরোধ-প্রথা—ইহা দেশের পল্লী-

গ্রামে কখনও পূর্ণ মাত্রায় ছিল না। সহর অঞ্চলেই উহার প্রচলন সচরাচর অধিক। আজ কাল উহার যে কিরিতঃ শৈথিল্য দেখা যায়, তাহার পথপদর্শক ব্রাহ্মসমাজ। ২৫-৩০ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় অনেক মর্গাদাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীর মহিলাদের মধ্যে ঘোড়ার গাড়ী চড়ার প্রকৃতি পর্যন্ত ভাল প্রচলিত ছিল না। এখন সেই সকল বাড়ীর শ্রীলোকেরা গাড়ী চড়িয়া বাছুর, পশুশালা প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইতেছেন, এবং সার্কস ও নাট্যমন্দিরেও বাহিতেছেন। পুরীতে এখন তাহাদিগকে দলে দলে সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতে দেখা যায়। মধুপুর, বৈষ্ণবপ্রভৃতি স্থানে রাস্তা ঘাট, পাহাড় ও পর্বতে এখন পুরুষাপেক্ষা মহিলাদিগেরই বেশী-সমাগম, এমন কি ইংরাজবহুল দার্জিলিংএর পাহাড়েও তাহারা নিতান্ত বিরল নহেন। অল্পে অল্পে সমাজে স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে কিরূপ পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহার প্রতি অনেকের লক্ষ্য নাই। এই সব সামাজিক বিষয়ের প্রতি বাহারা একটু মনোযোগ দেন, তাহারা ৫০ বৎসর পূর্বে অবরোধ-প্রথার কি অবস্থা দাঁড়াইবে, কিয়ৎ পরিমাণে অসম্ভব করিতে পারেন। নীরবে এই যে পরিবর্তন চলিতেছে ইহার মূলে ব্রাহ্মসমাজ।



বামাবোধিনী পত্রিকার উপহার।



বিবাহবিবাহ—সমাজের উচ্চতম স্তরে অতি অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ প্রথা অল্পে অল্পে কনিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। ৪০ বৎসর পূর্বে কোন ভদ্রপরে দশ বৎসরের বালিকা অবিবাহিত থাকিলে নানাদিক হইতে নিন্দাবাদ ধ্বনিত হইত। এখন যেখানে সহরের ঢেউ পৌছিতে অনেক সময় লাগে, এমন স্থান পল্লীগ্রামেও ১২।১৩ বৎসরের অবিবাহিত কন্যা নিতান্ত বিরল নহে। কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে যে সব বংশকুলসম্পাদার গোরব করেন, তাঁহাদের মধ্যেও ১৩.১৪, এমন কি কখন কখন ১৫ বৎসরের অবিবাহিতা বালিকা পূর্ণাঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে হইবার নানা কারণ। তাহার অনুসন্ধান প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন এখানে নাই। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে কন্যা একটু বেশী বয়সে বিবাহিতা হইলে যে কিছুই ক্ষতি হয় না, এবং ইহা যে উচ্চতম পুরুষদের নিরপগমনের অজ্ঞতম কারণ নহে, তাহা অনেক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু এখন বুঝিয়াছেন। আশা করা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ক্রমে সমাজের নিম্ন স্তরে অনুসৃত হইবে। বালিকার বিবাহের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে বালকের বিবাহের বয়স বৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ১৩।১৪ বৎসরের বালিকার সহিত ১৭।১৮ বৎসরের বালকের বিবাহ যে অসঙ্গত, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে অনেক

বৃদ্ধক ২০।২১ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে আর বিবাহ স্থপ্ন অনুভব করিতে পারেন না। এই যে আশ্বে আশ্বে পুত্র কন্যার বিবাহের বয়সবৃদ্ধি, ইহার অত্র আমরা কি কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের কাছে খাণী নই? ব্রাহ্মসমাজ ইহার পথ দেখান এবং নানা কারণে হিন্দুসমাজ সেই পথ অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিবাহবিবাহ—ইহা যে হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তবে সমাজের কতক লোক ইহার প্রতি কিছু অনুকূল নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বা করিতেছেন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অতুক্তি হইবে না। বিবাহবিবাহ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত মহাশয়ের মহতী চেষ্টা যে কখনও ফলবতী হইবে না, ইহা জোর করিয়া আর বলা যায় না। বিবাহবিবাহ যে কোনরূপে অজ্ঞায় ও নীতিবিরুদ্ধ নহে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিশেষরূপে হইয়াছে। বাহিরে স্বীকার করুন আর নাই করুন, যে সকল হিন্দু এখন ইহার প্রতিকূল নন, তাঁহারা যে ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা ও কার্য দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্ররোচিত হন নাই, এ কথা কোন নিরপেক্ষ লোক বলিতে পারেন না।

বহুবিবাহ হ্রাস—ইহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। অল্প দিনের মধ্যেই হিন্দুসমাজে ইহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। একেবারে ইহা আজও উঠিয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের



ভিত্তর ইহা যুগের চক্ষে লক্ষিত হইতেছে। বিবাহের প্রতি, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের প্রতি এখন আমরা নূতন ভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়েও কতকটা আমাদের পথ প্রদর্শক। বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বহুবিবাহ ব্রাহ্ম সমাজের বিবাহের আইনবিরুদ্ধ।

সার্বজনিক ভাব-আমাদের মধ্যে অতি অল্পে অল্পে একটা সার্বজনিক ভাব আসিয়া পড়িতেছে, এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। হিন্দু হউন বা মুসলমান কি খ্রীষ্টান হউন, ব্রাহ্ম হউন বা নমঃ-গুপ্ত হউন, আমরা সকলে বাঙ্গালী এবং সেই জন্য এক মাতার সন্তান, সকলেই ভ্রাতৃত্ব-সুত্রে আবদ্ধ, এইরূপ ভাব দেশের কতকগুলি লোকের মনে উদয় হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প সন্দেহ নাই, কিন্তু আশা করা যায় যে, দেশবাসগণের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের দল ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে এই হতভাগ্য দেশের যে কখনও কোন উন্নতি হইবে এরূপ মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দুসমাজ জাতি-ভেদ প্রথারূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত। ইহাতে “বার বজ্রপুত তের হাঁড়ী।” ফল দাঁড়াইয়াছে আমাদের মধ্যে পুণ্ড্র ভাব বড়ই শবল। একজন নিম্ন শ্রেণীর লোক একজন উচ্চ শ্রেণীর লোকের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিবে, ইহা অনেক উচ্চ শ্রেণীর লোক কল্পনাতেও আনিতে অক্ষম। বৌদ্ধ-যুগে এই পুণ্ড্র ভাবের,

এই অহুদার ভাবের অপনয়নের চেষ্টা হয়। চৈতন্য দেব যখন তাঁহার প্রেমময় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন, তখনও এইরূপ চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ফল কতদূর হইয়াছে সকলেই জানেন। বর্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই চেষ্টা আবার হইতেছে। দেশের কতকগুলি লোকের মনে এই সার্বজনিক ভাবের উদয় হইয়াছে। এক মাতৃভূমির সন্তানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব জ্ঞান একান্ত আবশ্যক, নতুবা তাহাদের উন্নতি অসম্ভব। এই ভাবের জন্য ইংরাজী শিক্ষার নিকট আমরা যে বিষয়রূপে ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রাহ্মেরা যে ইহার বিস্তৃতির জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতেও অগুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ কাল সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে উত্তোলন করিবার কিছু কিছু চেষ্টা হইতেছে; বাহাতে তাহারা সমাজ হইতে চলিয়া না যায়, এরূপ ইচ্ছা অনেকের মনে উদয় হইতেছে। এই ইচ্ছা এবং এই চেষ্টার মূলে যে ব্রাহ্মসমাজ রহিয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। দেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্বাবিস্তারের পক্ষে বিশেষ সহায়তা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

বাঙ্গালী সাহিত্য—ইহা কি ব্রাহ্মসমাজের নিকট কোন বিষয়ে ঋণী নহে? অনেকে বলিবেন এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করা কেন? রাজা রামমোহন রায় প্রথমে বাঙ্গালী ব্যাকরণ লিখিতে চেষ্টা করেন।



তাহার সর্বতোমুখী প্রতিভার বলে তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন যে, উচ্চ সাহিত্য দেশোন্নতির প্রধান সহায়। তিনিই বাঙ্গালা গল্প লিখনপদ্ধতির প্রবর্তক। তাহার গল্পে ও আজকালকার গল্পে বিস্তর প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু রাজা যখন গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল ইহা যদি একবার ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে তাহার পথে কিরূপ বাধা বিঘ্ন ছিল। তাহার বিজ্ঞা বুদ্ধি ছিল বলিয়াই তিনি সে সকল বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের কিছুদিন পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের এক অক্ষয়কীর্তি। বঙ্গের সাহিত্য জগতে উহা এক নবযুগ আনয়ন করে। উহার সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, বিজ্ঞানাগর মহাশয় ও মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্ত কিরূপ সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা বর্ণনা করা এখানে অনাবশ্যক। যিনি বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তিনি উহা সম্যক্রূপে অবগত আছেন। তার পর কতকগুলি অতি উচ্চ-ভাবপূর্ণ সুললিত বা গম্ভীর ধর্মসঙ্গীত যে বঙ্গভাষা ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে পাইয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। উচ্চ অঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীতে দেশ প্রাণিত বলিলেও অত্যাশ্রিত হইবে না। আর এক কথা—বাঙ্গালা ভাষায় যে সুন্দররূপে ধর্মোপদেশ দেওয়া এবং ওজস্বিনী বক্তৃতা করা যায় ইহাও

আমরা প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের নিকট শিক্ষা করি। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকেরা উহা প্রবর্তিত করেন, সন্দেহ নাই। বিদেশীয় বলিয়া তাহার উহার বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। তাহাদের হস্তে বাঙ্গালায় ধর্মোপদেশ ও বক্তৃতা জীবনশূন্য ছিল। ব্রাহ্মসমাজ উহাকে জীবনী শক্তি প্রদান করেন। হিন্দুসমাজ এখন বাঙ্গালা ভাষায় ধর্মোপদেশ ও বক্তৃতা দেওয়া পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

(৬)

আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না। আমার যে আর অধিক কিছু বলিবার আছে তাহাও মনে হয় না। অতএব প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। ব্রাহ্মসমাজ আমাদের কি করিয়াছেন তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ অবশ্য ইংরাজী শিক্ষার ফল, এ কথা সকলেই জানেন এবং উপরেও ইহা বলা হইয়াছে। কাজে কাজেই যে সকল উন্নতি ও পরিবর্তনের কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা নিদানপরম্পরা সম্বন্ধে ইংরাজী শিক্ষার ফল বলা যাইতে পারে। অনেক ইংরাজী শিক্ষার নানা প্রকার দোষ দেন বটে, কিন্তু উহা হইতে আমাদের যে বহুল উপকার সংসাধিত হইয়াছে, তাহা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির অবিদিত নাই, এবং কোন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহা অস্বীকার করিবেন না। এক কথায় বলিতে

গেলে ইংরাজী শিক্ষা আমাদেরকে বাহু্য করিয়াছে। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যদি আমাদের সমাজের বর্তমান উন্নতি ও পরিবর্তনের মূল কারণ ইংরাজী শিক্ষাই হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের আর কি করিবার ছিল? উত্তরে এই-মাত্র বলা যাইতে পারে—ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কাজ—সব পরিবর্তন ও উন্নতিকে দেশী ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করা। কোন কোন পরিবর্তন দেশী ছাঁচে ঢালা না হইলে দেশজাত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব অতি অল্পই ছিল। ঐ সময়ে শিক্ষিত সমাজ কোন দিকে পরিচালিত হইতেছিলেন তাহার আভাস উপরে দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় না হইলে প্রাক্তন সমাজ কোন দিকে ভাসিয়া যাইত, তাহা অবশ্য ঠিক করিয়া বলা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এ সংকে কি করিয়াছেন, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। প্রথম অবস্থায় অনেকগুলি উন্নতি ও পরিবর্তন বিদেশীয় গন্ধে দূষিত ছিল। ব্রাহ্মসমাজের বহুল চেষ্টার ফলেই সেই গন্ধের দূরীকরণ সংঘটিত হয়, এবং এখন যে সেগুলি অনেকটা দেশীয় ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহার মূল ব্রাহ্মসমাজ। উন্নতি দেশীয় ছাঁচে ঢালা না হইলে বিফল হইবে, এবং জনসাধারণ উহা গ্রহণ করিতে বিমুখ

হইবেন। দেশের লোকের মন আকর্ষণ করিতে না পারিলে সকল উন্নতির চেষ্টা পুণশ্রম হইবে। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায় লোকে ইহা বুঝিতে পারেন নাই বা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। ইংরাজী শিক্ষিত দল বোধ হয় সাধারণ সমাজের কথা ভাবিতেনই না, কিম্বা মনে করিতেন ক্রমে তাহারা উহা হইতে পৃথক হইয়া না বিলাতী না দেশী এক অভিনব দল হইবেন। তাহাদের মন হইতে এই হাত্তোৎপাদক ভ্রম দূর করিবার মূল ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজ ইংরাজী শিক্ষার অফলগুলিকে যতদূর সম্ভব দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করেন। সব সময় উহা যে জ্ঞানভ্যাস করা হইয়াছিল একপ মনে হয় না। সব সময় যে ঠিক প্রথা অঙ্গশ্রিত হইয়াছিল, ইহাও মনে হয় না। তবে অনেক পরিমাণে যে সে চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মসমাজের যে কোন ভুল হয় নাই, বা কোনরূপ দোষ নাই, এ কথা বলি না। সে আশোচন্য এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নছে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা কি উপকার পাইয়াছি তাহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সকল চিন্তাশীল লোকেই স্বীকার করিবেন যে, অতীতে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে, বর্তমানেও হইতেছে। ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারি না।

দে।

প্রায়শ্চিত্ত ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

হরিশপুত্রের অন্য মহাধর্ম। জমিদার নবকিশোর বাবুর পৌত্রী নীরজার বিবাহ। উৎসবের আলোকে গ্রামের বৃক্ষগুলি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। অনবরত বাদ্য ও জনকোলাহলে কাহারও ভাবা বুঝা বাইতেছে না, কেবল একটা কর্ণ-বধিরকারী তুমুল শব্দ, আলোক, এবং জনসমূহের চাকলা একটা মহা সমারোহের ব্যাপার জ্ঞাপন করিতেছে।

যথাসময়ে বাদ্য ও কোলাহল দ্বিগুণ হইল। চতুর্দলে চড়িয়া একটি অজ্ঞাতশব্দ বরবেশী বালক আসিয়া সভায় বসিল। নবকিশোর বাবু নবজামাতার চান্দমুখখানি দেখিয়া আনন্দে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র বিমলাচরণের একেবারে বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইল। তিনি একটি নিভৃত কক্ষে একজন প্রিয়তম বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বন্ধু বলিলেন “কিহে বিমলা, এই বুঝি এডু-কেশন ? একটা অপগুণ্ড বালকের সঙ্গে সপ্তমবর্ষীয়া কস্তুর এইরূপে বিবাহ দিয়া বুঝি সমাজসংস্কার করিতেছ ? ভারতের সর্বনাশকারী বালাবিবাহ রোধ ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তনের জন্ত যে জীবন উৎসর্গ করিবে বলিয়াছিলো, সে সব দীর্ঘ ছন্দে বক্তৃতা, দীর্ঘখাস, সমাজের জুপে অশ্রু-বিনজুন সব বুঝি (Mess এর teapot)

মেসের চাঁদানীর ধোয়ার মেখে জমিয়া ছিল ?” বিমলাচরণ চশমাটা নিকারনে খুলিয়া, মুছিয়া, গোপ দাড়ীটা চুমরাইয়া আবার তাহা পরিয়া বলিলেন “কি করি বল ভাই ? তাঁহাদের মতে নীরজার বিবাহ দেব না, এই কথা বলাতে বাবা একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন ‘তাহা হইলে তোকে তাজাপুল করিব জেনে রাখিস্।’ বাবার যে কথা সেই কাজ, জান তো ভাই, কাজেই চুপ করিতে হইল। বাবা বর্তমানে আমার কোন আশাই পুরিবে না।” বন্ধু বলিলেন “হাঁ, ভাগ করা অম্মনি মুখের কথা।” বিমলাচরণ বলিলেন “সে কথা পরে হবে, বাবা হয়তো এখনি ডাকবেন। অম্মনি বিবাহ আগি দিতে পারিব না ; চল একটু রাত্তায় গিয়া বেড়াই।” বন্ধু বলিলেন “সে ভয় করিও না, সাত বছরের গৌরীদানের ফলে তোমার বাবা তোমাকে ভাগ বসাতে ডাকিবেন না।” “তা না হলেও হয়তো দেগুতে ডাকবেন, চল একটু ও দিকে বাই।” দুই জনে বাটা হইতে বাহিরে বেড়াইতে গেলেন। বর্ত্ত নবকিশোর বাবু গুনরা বলিলেন “ওটা উচ্ছন্ন গেছে।”

বিবাহ আরম্ভ হইল। নীরজার শুভ কোমল কৃত্ত হস্তখানি লইয়া আর একখানি শুভ কোমল হস্তে বাঁধিয়া দিবার সময় নব-

কিশোর বাবুর চক্ষে অনাহুত এক ফোটা অশ্রু আসিয়া পড়িল, তাহার আদরের গৌরী আজ পরের হইল বলিয়া না কি ? বিবাহের পরে বর কস্তাকে ক্রোড়ে লইয়া নবকিশোর বাবু আশীর্বাদ করিলেন। নীরজা তখন ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত দিনের উপবাসে ও একটা অজ্ঞাত আনন্দ ও শ্রমে তাহার গুহ্র স্বন্দর কচি মুখখানিতে অর্কনির্মীলিত চক্ষের পাতার উপর একটা স্নান ক্রান্তির ছায়া পড়িয়াছিল। নবকিশোর বাবু সম্মুখে তাহার স্নেহসিক্ত হৃদয় ললাটে চুম্বন করিলেন। অক্ষুট আশীর্বাদ তাহার কম্পিত ওষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইল। এই মুহূর্ত্তে পুরোহিত-প্রমুখ সকলের চীৎকারে শুভ্রাচ্ছন্ন বালিকা চমকিয়া উঠিল। নবকিশোর বাবু সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, বরণডালার পদীপের উপরে নীরজার বস্ত্রের স্বর্ণাঙ্কল পড়িয়া অলিয়া উঠিয়াছে।

অল্প কেষ্ট তাহাদের নিকটে না আসিতে আসিতেই বর নীরজার অঞ্চল টানিয়া লইয়া হস্তঃ দর্পণের আঘাতে ও কংকার দিয়া অগ্নি নির্বাপিত করিল। নীরজা দেখিল তাহার বরণতো বৈশ্বাহসী। বরণ সেই সময়ে একবার সভর ও চকিত দৃষ্টিতে তাহার বধুর মুখখানি দেখিয়া লইল। অগ্নি-নির্বাপণের পরেও সে দুই তিন বার চোখ ঢুলিয়া কস্তার দিকে চাহিয়াছিল।

অগ্নি নিভিল, কিন্তু নবকিশোর বাবুর মনের ধূমরাশি মিলাইল না। একি অগণ্য।

তাহার পরে নীরজা স্বপ্নবাকী বাইল। তিন চারি দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া নবকিশোর বাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল “আমায় কোথায় পাঠিয়েছিলে, আমার বাবার জন্তে কত কান্না পেত, দাদার জন্তে কান্না আসত, সব চেয়ে তোমার জন্তে কাদতাম, আর মন কেমন করত। আর আমায় সেখানে পাঠিও না, দাদা বাবু”। নবকিশোর বাবু কাতর হইয়া বলিলেন “ছি দিদি, ও কথা বলো না, কেমন স্বন্দর শীথা পরেছ, সিঁদুর পরেছ! আরে তারা আমার দিদিকে যে একেবারে যেয়ে মারুব সাজিয়ে দিয়েছে! দেখি দেখি।” লজ্জায় নীরজা দাদা বাবুর কোলে মুখ লুকাইল।

চারি মাস পরে মধ্যমী পূজার দিন নবকিশোর বাবু পূজাস্থে নীরজাকে কোলে লইয়া নিকটে নবমবর্ষীয় পৌত্র স্নেহজ্ঞকে ও লইয়া বসিয়া আগমনীর শানাইয়ের আলাপ জনিতেছিলেন এবং ভক্তির উচ্ছুসে এক একবার কাদিয়া ফেলিতে-ছিগেন। কারণ না বুঝিয়া ও দাদাবাবুর চোখে জল দেখিয়া নীরজার চোখেও জল আসিয়াছিল। চারি দিকে আনন্দ-কোলাহল। সহসা একখানি পত্র আসিল, সংবাদ “—জামাতা ব্রজনাথ মারা গিয়াছে।” নবকিশোর বাবু কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া নীরজাকে ক্রোড়ে করিয়া একটা কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। বাহিরের ক্রন্দন-কোলাহল শুনিয়া নীরজা কারণ জানিতে বাইতে চাহিলে তাহাকে বন্ধে

চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন “দিদি তুই এই-
খানে থাক্, বাহিরে যাব্‌নে।” প্রতিমার
সেই যশ্‌মৌ পূজার দিন ভিন্ন আর পূজা
হইল না। অমিদারবাড়ীর জুগোৎসব
সেই হইতে বন্ধ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কয়েক দিন পরে বিমলাচরণ শোকাবুল
হইয়া নবকিশোর বাবুকে যথেষ্ট ভৎসনা
করিলেন। নবকিশোর বাবু একটীও
উত্তর না দিয়া নীরবে অধু অশ্রু মোচন
করিতে লাগিলেন। শেষে বিমলাচরণ
বলিলেন “আমি আপনার নিকট হইতে
চলিলাম, উপার্জনক্ষম হইলে স্ত্রী পুত্রাদি
লইয়া যাইব। আপনি অল্প বয়স হইতে
আমার সর্পনাশ করিয়াছেন, বালক-বয়সে
আমার বিবাহ দিয়া আমার সমস্ত জীবন
অসার করিয়া দিয়াছেন, তাহা না হইলে
এত অল্প বয়সে আমাকে একরূপ সাধারণ
বঙ্গবাসীর মত জীবনের সূত্রপাত দেখিতে
হইত না। আমি কি আশা করিয়াছিলাম,
আমি কি হইতাম তাহা আপনাকে আর
কি বলিব, আপনার অদৃষ্টে সেইরূপ পুত্র
নাই, তাই আমার সর্পনাশ করিলেন।
যাক্ আমি চলিলাম, আপনি জাতিকুল
লইয়া থাকুন।” মর্মাহত নবকিশোর পুত্রের
হাত ধরিলেন। পুত্র গুনিল না, যাইবার
সময় বলিয়া বাইল “নীরজাকে তাহার
বৈধবোর কথা বলিবেন না, আমি
আপনার জ্ঞান নিশ্চয় নই, আমি তাহার
পিতা, তাহাকে স্মৃতি করিবার চেষ্টা করিব।

বিমলাচরণ উপার্জনেচ্ছায় কলিকাতায়

চলিয়া গেলেন। নবকিশোর বাবু চক্ষু
মুছিতে মুছিতে নীরজা ও সুরেন্দ্রকে
কোলে লইয়া বসিলেন। পৌত্র সুরেন্দ্রের
অপেক্ষা নীরজাকে তিনি অধিক ভাল
বাসিতেন।

বিমলাচরণ বলিয়া গিয়াছে “নীরজাকে
বৈধবোর কথা জানাইও না”। নবকিশোর
বাবু ভাবিয়া ভাবিয়া বুঝিলেন ইহা না
জানাই ভাল, যতদিন না বুঝে সুরে
থাকিবে। তবে বিমলাচরণের শেষবর
কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না।

প্রথমে যখন নীরজার স্মৃতি স্মরণ
মুছিয়া ও নোওয়া খুলিয়া দেওয়া হইল,
তখন সে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিল। কান্না-
কাটিতেও সে ততোধিক বিস্মিত হইল।
তাহার মাতাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে
তিনি বেশী কাদিয়া উঠিলেন, সেইজন্ম
আর নীরজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল না।
একদিন ভয়ে ভয়ে তাহার দাদাবাবুকে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। যখন দেখিল
দাদাবাবুও মুখ ঢাকিল, তখন সে তাহার
কৌতূহলবৃত্তি প্রশমিত করিতে লাগিল।
ক্রমে ক্রমে বহু দিন যাইতে লাগিল, সে
সব ভুলিয়া গেল। সুরেন্দ্র বরটার কথা
বিবাহের পর প্রথম প্রথম কয়েক দিন
মনে পড়িয়াছিল, তারপরে একটা খেলানা
পাইলে শিশু যেমন হারান খেলানাটা
ভুলিয়া যায়, নীরজাও তেমনি বরটার মুখ-
খানি বিস্মৃত হইয়াছিল। তবে যখন তাহার
বরের কথা সকলে বলিত, তখন সে
জানিত তাহার বর বলিয়া কিছু ছিল।

তাহার পরে সে সব কথা আর কেহ বলিত না, কাজেই সেও তাহাকে ভুলিয়া গেল। মনে করিয়া দিবারও কেহ ছিল না, কেননা নবকিশোর বাবু কোনও বাহক বালিকার সহিত তাহাকে খেলিতে বা মিশিতে দিতেন না। নীরজার জ্ঞানের উদ্যেগ হইলে ভ্রাতা সুরেন্দ্র ও দাদাবাবু তাহার খেলার, গল্পের, আমোদের ও হাসির সম্মী, এখনও তাহাই।

নবকিশোর বাবু পূর্বে তাহাকে পড়িতে শিখাইয়াছিলেন, এখনও তিনি একাগ্র-চিত্তে নীরজার শিক্ষার দিকে যত্ন করিতে লাগিলেন। যেমন পাঠ্য পুস্তক পড়াইতেন, সেই সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, নীতার বনবাস, রামবনবাস প্রভৃতি পড়াইতেন এবং সন্ধ্যায় ও সকালে বাগানে গঙ্গার সোপানে নীরজা ও সুরেন্দ্রকে দুই দিকে বসাইয়া আগনি মধ্যে উপবেশন করিয়া কত নীতিপূর্ণ পৌরাণিক গল্প বলিতেন। কেমন করিয়া পাঁচ বৎসরের শিশু গ্রন্থ পদ্মপলাশ-লোচনকে আকুলপ্রাণে ডাকিতে ডাকিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার দুঃখিনী মাতার করুণ বিলাপ শুনিয়া কেমন করিয়া গাছের পাতী-গুহাও কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। রাজকুমার প্রহ্লাদ হরির নামে সর্পতাগী হইয়া কত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। রাজকন্যা সীতা ও সাবিত্রীর কথা, তাঁহারা কেমন করিয়া পিতা, মাতা, স্বজন, শত্রু, পতি ও অস্বীয় স্বজনকে প্রীত করিয়া-

ছিলেন। রাজকন্যা হইয়া তাঁহারা কত কষ্ট সহিয়াছিলেন। কেমন করিয়া সাবিত্রী যমের নিকট হইতে মৃত পতিকে বাঁচাইয়া-ছিলেন, ইত্যাদি বহু নীতি ও ভাবপূর্ণ কথা নবকিশোর বাবু গভীরকণ্ঠে তাহাদিগকে বলিতেন। কখন কখন নবকিশোর বাবু রামবনবাসের ও সীতানিসর্জনের ছবি আনিয়া সেই শোকাবহ ঘটনার গল্প বলিতেন। তখন নীরজা শোকাভিভূত ও ব্যথিতহৃদয় হইয়া সত্য সত্যই কাঁপিয়া উঠিত। আবার রামের বন হইতে পুনরাগমন, রাজ্যপ্রাপ্তি, সীতা উদ্ধার শুনিয়া শাস্ত হইয়া শযায় গিয়া শয়ন করিত। রাতিকালে সেই সকলই স্বপ্নে যেন প্রত্যক্ষ দেখিত।

প্রভাতে নবকিশোর বাবুর সজ্জিত পুষ্প চন্দন করিয়া আনিয়া নীরজা তাঁহার পূজার আয়োজন করিয়া দিত। নবকিশোর বাবু চন্দনের ফোঁটা পরিয়া তাহাকে একটা পরাইয়া দিতেন। তখন নীরজা পড়িতে বসিত। নবকিশোর বাবুর পত্নী বর্তমান ছিলেন না, সুতরাং নীরজার মাতাই গৃহিণী।

বাহিরে ভিক্ষার্থী আসিলে নবকিশোর বাবু তাহাকে অন্তরে ডাকিয়া আনিতেন। নীরজা মহানন্দে তাহাকে নিজে পরিবেশন করিয়া ভোজন করাইত। পরে তাহার প্রার্থিত দ্রব্য নীরজার হাত দিয়া তাহাকে দান করাইয়া নবকিশোর বাবু তাহাকে বিদায় দিতেন। নীরজার আনন্দে নবকিশোর বাবু ক্রমশঃ সব দুঃখ ভুলিতে

লাগিলেন। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে
লাগিলেন কিসে এই কোমল কলিকাটির
গায়ে সংসারের একটুও রৌদ্র না লাগিতে
পারে। তাই নিজের বিশ্বাস, চেষ্টা ও
পবিত্রতার দ্বারা নীরজার মুকুলদৃশ
জীবনটী ধীরে ধীরে প্রক্ষুণ্ণ করিতে
লাগিলেন। হায় নির্দোষ মানব! কার্য-
কারবপরম্পরাগত নিয়তির বে গতি,
তোমার কি সাধ্য তাহা রোধ কর! বুঝা
আকুল চেষ্টার ব্যাকুলপ্রাণে নিঃসার
শৃঙ্খল ভাঙিতে চেষ্টা করিতেছ।

এমনি করিয়া দুই বৎসর কাটিয়া গেল।
ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রকে বিমলাচরণ এক বৎসর
পরেই কলিকাতায় লইয়া গিয়াছেন।
সেখানে বিমলাচরণ ওকালতি করেন,
এখন বেশ পসার হইয়াছে। তিনি স্ত্রী ও
কন্যাকে পাঠাইবার জন্য পিতাকে লিখিয়া
ছিলেন। নবকিশোর বাবু কোন উত্তর না
দেওয়ায় পুনর্বার লিখিয়াছেন যে, আমি
পুত্রার বন্দে গিয়া তাহাদিগকে লইয়া
আসিব, তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া
রাখিবেন।

প্রার্থনা।

স্বপ্নমন্দির মম তোমারি নিশয়ভূমি,
কোথায় পূজিছ বুঝা আমারি অন্তরে তুমি।
এস নাথ প্রকাশিয়া জুড়াক তাপিত প্রাণ,
জীবনের ভুল জাতি হয়ে থাক অবসান।
যখন তোমারে খুঁজে ভ্রমিলাম বিশ্বমাক
অন্তরে নীরবে বসে সেবেছিলে বিশ্বরাজ।
হৃদয় ভকতি পুষ্পে সবতনে মালা গাঁথি
কাহারে পরাব ভেবে কাটায়েছি
সারা রাত্রি।

ফিরেছি মন্দিরদ্বারে হাতে লয়ে গাঁথা মালা
কক্ষদ্বার খোলেনি ত বুঝা চলে গেছে বেলা।

এখন শুকাল ফুল নাহিক সুরভি আর
কি দিব কি আছে মম আছে মাত্র ভক্তি হার।
লখ নাথ লও তুলি দাও ও চরণে স্থান,
দীনের এ তুচ্ছ দানে করিও না প্রত্যাখ্যান।
বরন পুণেছ দ্বার তখন দিয়েছ দেখা,
রোদিও না দ্বার পুনঃ আদারে রেখ না
একা।

তোমারি মন্দিরে বসি তোমারে পূজিব
আমি।
সে পূজা অন্তরে তুলে নিও তুমি অন্ত-
র্যামি।

শ্রী অম্বরূপা দেবী।

ভ্রমণ-কাহিনী।

(একজন বজুর কথা।)

আমার বয়স যখন আঠার বৎসর, তখন আমি পুরীতে ছিলাম। প্রায়ই প্রত্যহ জগন্নাথদর্শন হইত। বিমলা দেবীর রাঙ্গা পা দুখানিতে রাঙ্গা জবার অঞ্জলী দিতে কি ভালই লাগিত। আর কি সুন্দর সমুদ্র, তাহার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কত সুন্দর সুন্দর ফিলুক কুড়াইতাম। সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে কত লুটাপুটি খাইতে হইত। স্নানের সময় তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইত। এক দিন আমি ও আমার বন্ধু রমেশ খণ্ডগিরি দেখিতে গিয়া, তাহার অদূরস্থ জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলাম। ইহা যে দেবস্থান, দেবস্থানের মধ্যে হিংসা অস্বাভাবিক, সে কথা যেন কে ভুলাইয়া দিয়াছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল এমন সময় আমরা একটা হরিণ দেখিতে পাইলাম। অশ্বাদিগকে দেখিয়া হরিণটি প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। দুই দিক হইতে দুইজনে তাহাকে তাড়া করিলাম। আমাদের দুই জনেরই হাতে দুইটি বন্দুক ছিল। দুই জনেই একসঙ্গে গুলি করিলাম। আহত হইয়া একবার মাত্র সে আমাদের দিকে চাহিয়া সেইখানেই পড়িয়া গেল। তাহার বড় বড় চোখ দুইটাকে কষ্টের চিহ্ন মিলাইয়া গেল।

এমন সময় একটা গর্জনশব্দ শুনিয়া পিছনে চাহিয়া দেখি “এক প্রকাণ্ড ভালুক”। ভয়ে আমাদের তো শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। আমি রমেশকে বলিলাম “এখনই আমরা নির্দোষ হরিণটিকে মারিলাম তাহারই ফল পাইতেছি, বাহা ইউক সাহসে বুক বাধ”। আমি সাহসে ভর করিয়া বন্দুক উঠাইলাম। রমেশও উঠাইল, কিন্তু তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। আমি ভালুকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলাম। আমার গুলি মস্তকে না লাগিয়া পৃষ্ঠে লাগিল, কিন্তু রমেশের গুলি ভালুকের মাথায় লাগিল। তখন ভালুক চিংকারে বন কাঁপাইয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিল। আমরা আবার গুলি করিলাম, ভালুক মরিয়া গেল। আমরা আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তার পর আকাশের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ এতদূর বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে না, আমরা রক্ষার অযোগ্য হইলেও তিনি আমাদের ত্যাগ করেন নাই, হরিণটার সেই দৃষ্টির কথা মনে করিয়া প্রাণে কষ্ট হইল। ভালুক ও হরিণ মারিয়াছি, বাড়ী

আগিয়া সকলের নিকট গঙ্গা করিগান, কিন্তু
আজ্ঞা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। এখন
বুঝ হইয়াছি, এখনও মাঝে মাঝে সেই
কথা মনে হয় যে, নির্দোষ হরিণটাকে

খেলার ছলে হত্যা করিয়াছি, তাহার ফলে
আমাদেরও সেই রকম তাড়া পাইয়া
মরিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

শ্রীমতী কমলা দেবী।

(১১ বৎসরের বালিকা।)

মারনী মারভিল।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

“তাহা হইলে আমাকে শীঘ্রই মরিতে
হইবে, আর—”। লেডি পমরয়ের ভ্রাতা
লেডি পমরয়কে একপাশে অনঙ্গল বকিয়া
বাইতে গুলিয়া ভৎসনাশূচক স্বরে বলিলেন
“কি মিথ্যা বকিতেছ?”

লেডি পমরয় ভ্রাতার এইরূপ বাধা গ্রাহ্য
না করিয়া বলিয়া বাইতে লাগিলেন—
“আমি মরিয়া গেলে পর যখন আমার মৃত
দেহ ফুল ও ফুলের মালায় সজ্জিত করিয়া
সমাধিস্থানে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন
আমাকে কেমন স্মরণ দেখাইবে।
আমার স্বামী কেমন বিষন্ন ও নতবদনে
আমার শবাধারের অহুগমন করিবেন।
সকলে, দীর্ঘে দীর্ঘে কথা কহিবে। আমি
এখনই যেন ভৃত্যদিগকে বলিতে শুনিতে
পাইতেছি যে, আমার স্নান সৎলোকেরা
এই মলিন গাণপূর্ণ পৃথিবীতে থাকিবার
উপযুক্ত নহে। সৎলোকেরা অধিক দিন
পৃথিবীতে অবস্থান করেন না, কারণ
দেবলোকে তাঁহাদিগের অত্যন্ত আবশ্যক
হইয়া পড়ে। অবশ্য আমার শবাধারটি

দেখিতে অতিশয় সুন্দর হইবে, এবং
চারিটি খেতবর্ণের অর্থ তাহা বহন
করিয়া লইয়া যাইবে। আমার শব্দীর
সহিত এই সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ইতি-
পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছি। আমার শবাধার
খেত অর্থেই বহন করিবে। দীর্ঘ-লাঙ্গুল-
বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ অর্থ শবাধার বহন
করিতেছে ভাবিলে শব্দীর শিহরিয়া উঠে।
দীর্ঘলাঙ্গুলযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ অর্থ দ্বারা আমাদের
শবাধার বহন করাইবার রীতি কেন যে
দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে
পারি না।”

লেডি মেরি লেডি পমরয়কে এইরূপ
ভাবে কথা বলিয়া বাইতে শ্রবণ করিয়া
বলিলেন—“প্রিয়তম ডলি, এ কি ভীষণ
কথা? তুমি কি বলিবার আর কিছু পাইলে
না? কেমন করিয়া তুমি এমন কথা মনে
আনিতেছ? তোমার ঐরূপ ভীষণ কথা
শুনিয়া আমার হাত পা সমস্ত শিথিল
হইয়া আসিতেছে।

লেডি পমরয়ের ভ্রাতা লেডি মেরিকে

বলিলেন হাঁ, লেডি মেরি, ডলি কি মিষ্টর কথাই বলিতেছে। ইহা শুনিগে যথার্থই শরীর শিহরিয়া উঠে, উহাকে নিরস্ত করুন। উহাকে না নিরস্ত করিলে ঐ বিষয় লইয়া ও আধ ঘণ্টা ধরিয়া বাকতে থাকিবে। অস্বাভাবিকিয়া এবং কুকুর ও ঘোড়ার পরস্পরে কি কথা বলিয়া থাকে, ডলি সেই বিষয়ে কথা বলিতে অতিশয় ভালবাসে। আমি এমন অর্থহীন কথা আর কখন কাহাকে বলিতে শুনি নাই।

লেডি পমরর তাঁহার ভ্রাতার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—“তুমি নিশ্চয়ই অতি নিরোপ। ইহা অর্থহীন কথা নহে। কুকুর ও ঘোড়া নিশ্চয়ই পরস্পরে কথা বলিয়া থাকে। আজ প্রাতে যখন আমি আমার ঘোড়া জ্যাককে বলিলাম “জ্যাক্ আজ আমি তোকে ভ্রমার্থ বাহিরে লইয়া যাব, তখন সে আমার কথা শুনিবামাত্র দৌড়িয়া অরণ্যালে শৃঙ্গলাবদ্ধ ‘স্যালী’ নামক ঘোড়ার সহিত কি কথা বলিতে গেল। সে নিশ্চয়ই স্যালীকে তাহার বাহিরে বেড়াইতে যাইবার কথা বলিয়াছিল, তাহা না হইলে স্যালী এত রাগিয়া উঠিবে কেন?”

লেডি মেরি লেডি পমররকে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে পাদরী আনষ্টুথারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন “আমার বিশ্বাস, মিষ্টার আনষ্টুথার কোন একটি গুরুতর বিষয় সন্দেহে কোন কথা আন-দিগকে বলিতে আসিয়াছেন, নতুবা তাঁহাকে এত গম্ভীর ও চিন্তিত দেখাইতেছে কেন?”

মিঃ আনষ্টুথার আপনার কি বক্তব্য বলুন, আমি শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।”

পাদরী আনষ্টুথার এই সময় একটি উচ্চ চৌকির উপর হস্ত স্থাপনপূর্বক চিম্নীর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি লেডি মেরি কর্তৃক এইরূপে অগ্রসর হইয়া তাঁহার প্রতি নির্ভীক দৃষ্টিপাত-পূর্বক মুক্তকণ্ঠে বলিলেন “লেডি মেরি, আমি আপনার নিকট একটি অমূল্য প্রার্থনা করি, তাহা অত্যন্ত গুরুতর। সে অমূল্যটি এই যে ইলষ্টেল পল্লী-বাসিগণের বাহাতে ধর্ম্মে মতি হ্রস্ব, সেজন্য কার্যে আপনাকে সাহায্য সাহায্য দান করিতে হইবে।”

লেডি মেরি বলিলেন “হাঁ, নিশ্চয়ই। আপনি সর্বদাই আমার উপর সৌজন্য নির্ভর করিতে পারেন।” পাদরী আনষ্টুথার কর্তব্য কার্যে পরাভূত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা লেডি মেরির নিকট যে নিতান্ত অসামান্য ও অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইবে, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট উদ্দেশ্যনিন্দ্রি বিষয়ে সেইরূপে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তিনি চলিয়া যাইতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি মনকে দৃঢ় করিয়া লেডি মেরির কথার উত্তরে বলিলেন “আপনি সচরাচর দরিদ্রপল্লী বাসিদিগকে অর্থ ও বস্ত্রদানে যেরূপ সাহায্য করিয়া থাকেন, আমি সেজন্য সাহায্য প্রার্থনা

জন্ত এবার আমি নাই। আমি তাহা অপেক্ষা অল্প সহস্তর অল্পগ্রহ প্রার্থনার জন্ত আসিয়াছি। যদিপি সে অল্পগ্রহটি বড় অতিরিক্ত বলিয়া আপনার মনে হয়, তবে আমাকে তজ্জন্ত ক্ষমা করিবেন। এখানকার গল্পীবাসিগণের মধ্যে সতত আপনার উপস্থিতি এবং তাহাদের চুপ, কষ্ট ও শোকে আপনার ব্যক্তিগত সহানুভূতি প্রার্থনার জন্তই আপনার নিকট আসিয়াছি।”

যখন তিনি এই কথা বলিতে- ছিলেন, তখন তিনি সেই মহার্ঘ চিহ্ন ও আসবাব-সজ্জিত ক্র্যানুবয়েন-প্রাসাদ, লেডি পমরয় ও তাহার ভ্রাতার হাস্যোজ্জ্বল বিজ্ঞপ্তক নয়ন এবং তাহার প্রার্থনাটি কতদূর সঙ্গত, ইহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। কেবল মাত্র তাহার ধর্মমণ্ডলটির অন্তর্গত দীন পল্পী-বাসিগণের কথা তিনি স্মরণ করিতে- ছিলেন। তিনি কেবলি জীবন-সংগ্রামে পিষ্ট, দীন পল্পীবাসিগণের কথা ভাবিতে- ছিলেন। তাহারা চুপ, কষ্ট ও শোকের সময় তাহারি উপর নির্ভর করিয়া তাহারি নিকট সাহায্যের জন্ত আগমন করিয়া থাকে। ক্রাইষ্ট বৈরূপ সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি স্বরূপে তাহাদের সমস্ত পাপ, তাপ, মালিছ বন্ধ পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ সেই দীন পল্পীবাসিগণের প্রতিনিধি স্বরূপে তাহাদের মঙ্গল উদ্দেশে হাত, বিজ্ঞপ্ত ও তিরস্কারের পাত্র হইবার জন্ত প্রস্তুত

হইয়া আসিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

“লেডি মেরি! আপনার নিকটে এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমার ধর্মমণ্ডলের অন্তর্গত এই পল্পীটির আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধীয় কার্যে পাঁচ বৎসর ধরিয়া অবিরত পরিশ্রম করিবার পর আমি সম্পূর্ণরূপে অসিদ্ধ হইয়াছি।”

লেডি মেরি তাহার এইরূপ নৈরাশ্র-বাক্যক কথার উত্তরে স্তব্ধ অথচ উৎসাহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—

“না, না, আপনি একটুও অসিদ্ধ হয়েন নাই। আর এখন যখন আমি—”। পানরী আনষ্টবার লেডি মেরিকে আর বলিতে গিলেন না। তিনি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—

“না যথার্থই আমি অতি শোচনীয়রূপে অকৃতকার্য হইয়াছি। মানবজীবন এবং সমস্ত মানবীয় চুপ, কষ্ট ও শোক ঈশ্বরের প্রদত্ত দান মাত্র, ইলষ্টেলগ্রামবাসিগণের নিকটে সে সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে আমি এক্ষণে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। সম্প্রতি গ্রামে অত্যন্ত মৃত্যু ও পীড়ার প্রোহর্ভাব হইয়াছে। আজ জন মরণানের একটিমাত্র কথা মারা গিয়াছে।”

চিরচুখী জন মরণানের একমাত্র কথাটির মৃত্যু হইয়াছে শ্রবণ করিয়া লেডি মেরি গভীরসহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন—

"আমি এ সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।"

তৎপরে আনন্দুয়ার পূর্ববৎ সন্তোষ ও ঐশ্বর্যপূর্ণ বরে বশিতে লাগিলেন— "সম্প্রতি শেহানের বিধবা স্ত্রীর একমাত্র পুত্রটিও মৃত্যু হইয়াছে। কৃষক ডেবিডের পা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। দৈবাৎ পাড়িয়া বাওয়াল তাহার পা জালিয়া গিয়াছিল। আমি আপনাকে গ্রামবাসি-গণের এইরূপ দুঃখ ও দুর্দশা সম্বন্ধে বহু সংবাদ প্রদান করিতে পারি। কিন্তু এই প্রকার দুঃখ ও দুর্দশার কাহিনী বিবৃত করিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহস করি না। বজ্রায় ও তুষারপতনে সম্প্রতি শস্যেরও বহু ক্ষতি হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে অহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রাম-

বাসিগণ এতদিন অতি সাহসের সহিত এই সমস্ত দৈবদুর্ভিক্ষ ও দুঃখদুর্দশার সহিত সংগ্রাম করিতেছিল। এতদিন তাহারা সমস্ত আর্থিক দৈবদুর্ভিক্ষ ও দুঃখ দুর্দশা যে ঈশ্বরের বিশেষ বিধান, তাহাতে কোন সন্দেহ করিত না।

কিন্তু সম্প্রতি তাহারা বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি বহু চেষ্টায় তাহাদের বিশ্বাসহীনতা দূর করিতে পারিতেছি না। তাহারা আমার উপদেশ ও বাক্য অপরিণতবয়স্ক বাক্তির উক্তির দ্বারা উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে, আমি জগতের কিছুই জানি না। মূল কথা এই যে, তাহাদের অজ্ঞতাই তাহাদের কাল স্বরূপ হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতির প্রতি আরচরণ।

ভোগিনী শব্দের অর্থ বাহার ভোগ অর্থাৎ সুখভোগ আছে। প্রকৃত ভাবে বলিতে গেলে বিলাসোপভোগের জন্ত গৃহীতা হইতেন বলিয়া রাজার তাদৃশ পত্নীগণ ভোগিনীপদবাচী হইতেন। মহিষী ও ভোগিনী, এই দুই নামের অর্থ পর্যালোচনা করিলেও জানা যায় যে, নৃপতিদিগের ধর্ম্মাচরণের জন্ত একটি মাত্র পত্নী হইলেই চলিত। অতএব একাধিক বিবাহ করার আবশ্যকতা (অনেক স্থলেই) দৃষ্ট হইত না। আর্ঘ্য-

গণের একপত্নীক ব্রতপালনই প্রশংসনীয় ছিল।

পূর্বকালে বহু বিবাহ, বিলসনশীল নৃপতিদিগের মধ্যেই বহু প্রচলিত এবং তদনুসৃত সচরাচর বিরল ছিল। তৎকালে স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত থাকিতে স্বয়ম্বর-সভায় নিমন্ত্রিত অনেক বিবাহিত ভূপাল-দিগের লব্ধকণ্ঠে একরূপ জানা যায় যে, অনেকানেক প্রসিদ্ধ রাজা ধর্ম্ম-পত্নী বা রাজমহিষী ভিন্ন আর দার-পরিগ্রহ না করিয়া রাজসমাজে এক-

পত্নীক ত্রতের উজ্জল দৃষ্টান্ত রাবির গিয়াছেন।

গৃহস্থগণ বিনা কারণে ও বিনা দোষে পত্নী পরিত্যাগ করেন অথবা দারাহর পরিত্যাগ করেন, ইহা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু অবস্থার পত্নীর সংশ্রব ত্যাগ অথবা দ্বিতীয় দার পরিত্যাগ করা যাউতে পারে, তাহিষয়ে ভগবান্‌ মনু কতিপয় বিধি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। পত্নী যদি শত্রুভাবাপন্ন হন, তবে তাঁহার সেই ভেদভাব বিদূরিত হইল কি না তজ্জন্ত স্বামী এক বৎসর অপেক্ষা করিবেন। যদি উক্ত সময়ের মধ্যেও তাঁহার সেই ভাব বিদূরিত না হয়, তবে স্বামী তাঁহার সহিত একত্র বাস ত্যাগ করিবেন। যদি স্ত্রী মন্ত্যপাশ্বিনী, অসাধুশীলা, প্রতিকূলা (স্বামীর অভি-প্রায়ের বিপরীত কার্যকারিতা), চির-ক্লম্বা, অত্যন্ত ক্রুরভাবা বা অর্থনাশিনী হন তবে স্বামী পুনর্বার দারপরিত্যাগ করিতে পারেন। স্বামী স্ত্রী বন্ধা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপত্নী হইলে দশম বর্ষে, কেবল-কল্পা-প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে পুনরার দারপরিত্যাগ করিত পারেন; কিন্তু স্ত্রী যদি অগ্নিবাদিনী (স্বামীর প্রতি মন্দা অথবা অশ্রাব্য কটুভাবিনী) হন, তবে সদাঃ অর্থাৎ বধন অসহ্য হন, তখন কাণাতিপাত ব্যতিরেকে দ্বিতীয় দার গৃহণ করিতে পারেন।

উপরি-উক্ত যে কয়টি কারণে পুরুষের দারাহরপরিত্যাগের বিধি শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোনটিও অযৌক্তিক

নহে। অযৌক্তিক হইলে শাস্ত্রকার-গণ সেরূপ বিধান কেনইবা করিতে যাইবেন। স্ত্রীকে ভেদভাবাপন্ন জানিতে পারিলেই তাহাকে ত্যাগ করিবার বিধি নাই। তাঁহার মনোভাব পরিবর্তিত হয় কি না, তাহা পরীক্ষার জন্ত এক বৎসর কাল নিক্ষেপ হইয়াছে। মন্ত্যপাশ্বিনী নারী নৃত্যকবিকৃতি নিবন্ধন কাণ্যাকাণ্য বিচার করিতে পারে না, তাহা কতক ধর্মবিরুদ্ধ কার্যও অচুড়িত হয়, এই জন্ত ঐরূপ স্ত্রী ত্যাগার্হ। অসাধুশীলা ভাৰ্যা দ্বারা কুলের গৌরব ও পরিভ্রতা রক্ষা হয় না বলিয়া পতিকে পদে পদে অবমানিত ও হৃদিশাশ্রয় হইতে হয়, এই জন্ত ধর্মভ্রষ্টা স্ত্রী বর্জনীয়। পত্নী যদি স্বামীর অভি-প্রায়ের বিপরীত কার্য করে, তবে তাহাকে লইয়া গৃহস্থের সুখশান্তির সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং তথাবিধা পত্নী সত্ত্বেও গৃহস্থ পুনর্বার বিবাহ করিতে পারেন। পতির সহিত পত্নীর অকপট ব্যবহার কর্তব্য। যেখানে কপটতার প্রাচ-র্ভাব, সেখানে বিতৃষ্ণ প্রণয়ের সম্ভাবনা কোথায়? এই জন্ত স্ত্রী ক্রুরভাবা হইলে গৃহস্থের পক্ষে দ্বিতীয় ভাৰ্যা গ্রহণ করা নিন্দনীয় নহে। গৃহস্থের পক্ষে অর্থের সদ্যবহার ও মঙ্গল প্রধান কর্তব্য, তাহাতে আবার অনেক ব্যয়ভার গৃহিণীর হস্তে জম্ব থাকে। গৃহিণী গৃহস্থের আয়ের দিকে দৃষ্টি না করিয়া যদি অপরিমিত ব্যয় করেন, তবে সেই সংসার শোচনীয় দশায় উপনীত হইতে পারে।

ঐরূপে অভিযায়হেতু যাহাতে গৃহস্থের সংসার হীনদশাপন্ন হইতে না পারে, তত্ৰপায়বিধানার্থ শাস্ত্রকারগণ গৃহীকে বায়শীলা জী সবেও দ্বিতীয় দায় পরিগ্রহ করিতে বলিয়াছেন। চিরকল্পা জীয়ারা তাঁহার সংসারিক কার্য ও অশুভলতা চলিতে পারে না। পত্নী চিরকল্পা এবং বন্ধাদ্বাদি দোষে দূষিতা হইলে, গৃহস্থ পুনর্বার বিবাহ করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু পূর্বপরিণীতা জীকে ভরণ পোষণ হইতে বঞ্চিতা করিতে পারিবেন না। জী বন্ধা ও চিরকল্পা হইলে তাঁহার অমুমতি লইয়া পুরুষকে বিবাহ করিতে হইত। গুণবতী ভাৰ্যাও তাদৃশ স্থলে পতিকে স্বচ্ছন্দচিত্তে পুনর্বার দায় পরিগ্রহের অমুমতি দিতেন। জী বন্ধা হইলেও কোন কোন গৃহস্থ পুনর্বার বিবাহ করিতেন না। তাঁহার ভাবিতেন যে, অদৃষ্টে পুত্রলাভ না থাকিলে ভার্গ্যাস্তর গ্রহণ করিলেও ত পুত্র না জন্মিতে পারে? অনিশ্চিত পুত্রলাভের প্রত্যাশায় বিস্কন্ধ-প্রণয়িনী ধর্মপত্নীর সপত্নী-ভাব মাত্র স্থাপিত হইতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার বন্ধা পত্নী সবেও পুত্রলাভকামনার পুনর্বার দায় গ্রহণ করা সম্ভব মনে করিতেন না। প্রাচীন আৰ্য্যসমাজে পবিত্রতা, সংশ্লিষ্টা ও সাধুদ্বৈত প্রভাবে মনোপারিনী, অসাধু-শীলা প্রতিকূলা ও জুরস্বভাবা ভাৰ্যা প্রায়ই থাকিত না বলিয়া গৃহস্থের পক্ষে ঐরূপ স্থলে পুনর্বার বিবাহেরও প্রায়

প্রয়োজন হইত না। ভাৰ্যা অপ্রিয়-বাদিনী হইলে পতি পুনর্বার বিবাহ করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তৎসম্বন্ধেও কতকগুলি বিচার করিবার বিষয় ছিল। অনেক সময়েই ত দল্পতীনধ্যে কলহ ঘটে, সেই কলহোপলক্ষে অবৈধ্যা হইয়া গৃহী যদি হঠাৎ কোন অপ্রিয় বাক্য বলেন, তাহা হইলেই কি গৃহস্থ তাহাকে অপ্রিয়-বাদিনী বলিয়া স্থির করিয়া পুনর্বার বিবাহ করিবেন? তাহা কখনই নহে। আমিাকে চরিত্রদোষ বা অবিমৃশ্যকারিতা বশতঃ কোন দ্রুতকালে রত হইতে দেখিলে যদি জী কোন অপ্রিয় হিতবাক্য বলেন, তাহা হইলে কি তাঁহাকে অপ্রিয়বাদিনী বলিয়া বুঝিতে হইবে? অথবা কষ্ট-বিশেষে পড়িয়া বাদ মনের দ্বাখে আমিাকে অপ্রিয় কথা বলিয়া ফেলেন, তাহা হইলেও কি তাঁহাকে অপ্রিয়বাদিনী বলিয়া স্থির করিয়া পুনর্বার বিবাহ করিতে হইবে? তাহা কোন প্রকারেই হইতে পারে না। অপ্রিয় ভাষা যে নারীর স্বভাবসিদ্ধ দোষ, তাহাকেই অপ্রিয়বাদিনী বলিয়া জানিবে। বিস্কন্ধচরিত্র ও কার্য্যকার্য্যবিশেষজ পতি যথোপযুক্ত ভরণ পোষণ, প্রণয় প্রদর্শন, সদয় ব্যবহার ও মিষ্ট ভাষণ দ্বারা তুষ্ট করিলেও যে নারী প্রকৃতিগত অভ্যাস বশতঃ সর্বদা অথবা অশ্রাব্য কটুক্তি প্রয়োগ করিয়া আমিাকে শাস্তিলাভ করিতে দেয় না, সেই প্রকৃত অপ্রিয়বাদিনী জী। আত্মীয়, পরিচিত ও গ্রামবাসি-মাজেই যাহাকে ঐরূপ মুখরা ও আমীর

অশান্তিবিধায়িনী বলিয়া জানেন, তিনিই প্রকৃত অশান্তিবিধায়িনী। ঐরূপ জীব ব্যবহার যখন অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিলে, তখন স্বামী দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের চেষ্টা করিবেন। উক্ত বিষয়ে আর অধিক বিস্তারিতরূপে না বলিলেও চলে। শান্ত্রে

বিনা কারণে একাধিক দারগ্রহণের বিধি নাই বলিয়া বোধ হয় প্রাচীন আৰ্য্যগণ ধর্মপত্নীর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্কভৌম কাব্যার্থ ও পুরাণার্থ।

বাঘের আত্মকাহিনী।

চারি দিকে কেবলই মাছের মুখ। এখন রক্ত হইয়াছি এবং বোধ হয় শীতলই মরিয়া যাইব। আমার একটা নির্জন স্থানে মরিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এখানে তাহার কোন আশাই নাই। কারণ যখনই আমি বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই কোতুলকাকান্ত মাছের মুখ দেখিতে পাই। লোকে আমাকে ৭৮ সের সিদ্ধ ঘোড়ার মাংস খাইতে দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। তাহার বদি আমাকে ঘোবনকালে একটা বহুমহিম পাইতে দেখিত, তাহা হইলে না জানি কি বলিত। এখন ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খোঁচা মারিয়া আমার সহিত খেলা করে, কিন্তু এক সময়ে আমিই খিড়াল বেরূপ ইঁহর ধরিয়া খেলা করে, সেইরূপ মাছের ধরিয়া খেলা করিয়াছি। ছেলেবেলা হইতে আমার কাহিনীটা তবে ভোমদিগকে বলি।

এ যেন ঠিক কালকের কথা। আমি ও আমার দুই ভাই “সের আলি” এবং

“আফজল খাঁ” গুহার বালিকরা মেঝের উপর লুটোপুটী খাইয়া কত রকমই খেলা করিতাম। আমরা গুহার মুখ হইতে অদূরবর্তী মাঠে মা ও বাবাকে শিকার করিতে দেখিতে পাইতাম। যে দিন আমি প্রথম একটি হরিণ শিকার করি, সে দিনের কথা কি কখনও ভুলিতে পারিব? হরিণটা মাঠের মধ্যে চরিতেছিল। তাহার মধ্যে কেবল কতকগুলি ছোট ছোট ঝোপ ছিল। আমি গুড়ি মারিয়া এ ঝোপ হইতে ও-ঝোপে যাইতেছিলাম। যখনই হরিণটা মাথা তুলিতেছিল, তখনই আমি মাটিতে গুইয়া পড়িতেছিলাম। অনেক-ক্ষণ এইরূপ করিবার পর আমি শেষ ঝোপটার নিকটে পৌঁছিয়াছিলাম। হরিণটাও বিপদের আশঙ্কা না করিয়া চরিতে চরিতে সেইখানে আসিল। হঠাৎ এক লাফে আমি তাহার গিঠে চড়িয়া তাহার বাড় মটকাইতে লাগিলাম। কিন্তু বগিতে লজ্জা করে, তখন আমি অত্যন্ত

ছোট ছিলাম বলিয়া হরিণটা আমাকে পিঠে করিয়াই দৌড়িয়া গেল। যাহা হউক কোন প্রকারে আমি তাহার টুটিটা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

তাহার পরে যে ঘটনাটা ঘটে, তাহা এরূপ নির্বিশেষে শেষ হয় নাই। আমরা তিন ভাই তখন প্রায় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং নিজেরাই শিকার করিতে পারিতাম। একদিন আমরা তিনজনে একটা ডোবাতে জল খাইতে ছিলাম এমন সময়ে একটা বক্সশুকর আসিয়া আমাদের প্রতি দৃকপাত না করিয়াই জল খাইতে আরম্ভ করিল। সের আলির মেজাজটা একটু কড়া ছিল, সে কক্ষস্থরে শুকরকে সরিয়া যাইতে আদেশ করিল। কিন্তু শুকর তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ঠহাতে সের আলি ভয়ানক রাগিয়া শুকরটার উপর লাফ দিয়া পড়িল। শুকর চকিতের দ্বায় যুগ ফিরাইয়া দাঁড়াইল এবং সের আলি তাহার পিঠে না পড়িয়া তাহার তীক্ষ্ণ দন্তের উপর পড়িল। শুকরটা দাঁত দিয়া সের আলির চামড়া ছিঁড়িয়া দিয়াছিল বলিয়া আমরা কাণ্ড হেঁড়ার মত একটা চড় চড় শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম। সের আলি এই আঘাতে একটু কাবু ও অবাক হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই সামলাইয়া লইয়া আবার শুকরটার দিকে লাফ দিল। এবারও শুকরটা দাঁতের আঘাতে তাহার চোঁড়া বার্প করিয়া দিয়াছিল। সের আলির শরীর তখন রক্তাক্ত

হইয়া গিয়াছিল। সে নিজে আর আক্রমণ না করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। শুকরটা একটুও ভয় না পাইয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। এবার সের আলি লাফাইয়া শুকরটার মস্তক ডিঙাইয়া একেবারে তাহার পৃষ্ঠে পড়িল। কিন্তু শুকর মাটির উপর গড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে পিঠ হইতে ফেলিয়া দিল। কিছুক্ষণ হইলেনে মাটিতে লুটাপুট খাইয়া পরক্ষণেই শুকর অগ্রে মাটি হইতে উঠিয়া দম্ব দ্বারা সের আলির পেট হইতে গলা পর্যন্ত চিরিয়া দিল। এই আঘাতেই সের আলি একটা কষ্ট-হৃৎক চীংকার করিয়া থাবার এক আঘাতে শুকরের মাথার চামড়া তুলিয়া দিয়া পক্ষত্ব প্রাপ্ত হইল। আমি ও আফগল খাঁ সের আলির সাহায্যের জন্য আগেই বাইতাম, কিন্তু তাহার একটা বক্স শুকর মারিবার কষতা আছে, এই বলিয়া সে আমাদেরকে নিবেদন করিয়াছিল।

এখন সের আলির মৃত্যুতে ক্রোধান্বিত হইয়া আমি ও আফগল খাঁ এক সঙ্গে শুকরটাকে আক্রমণ করিলাম। সত্য কথা বলিতে কি ঐ শুকরটা অতিশয় সাহসী ছিল। সে আমাদের দুজনের আক্রমণ এমন স্থিরভাবে সহ করিয়াছিল, যেন তাহার পক্ষে একটা বাঘকে মারিয়া অপর দুইটা বাঘের সহিত যুদ্ধ করা নিতানৈমিত্তিক বাপার ছিল।

সের আলির অবস্থা বুঝিয়া আমরা সাবধান হইয়া গিয়াছিলাম এবং তাহার

নিকটে না বাইরা দূর হইতেই তাহার চারি পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় আশ ঘণ্টা ধরিয়া আমাদের যুদ্ধ চলিল। সের আলি প্রদত্ত মাথার আঘাত হইতে রক্ত গড়াইয়া চোখে পড়ায় শূকরটা ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না, বোধ হয় বিরক্ত হইয়াই গড়াই শেষ করিবার জন্য সে আফজল খাঁকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিল। আফজল খাঁও লাফাইয়া তাহার পৃষ্ঠে পড়িল। শূকরটা সের আলিকে যেমন করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছিল, আফজল খাঁকেও সেইরূপে ফেলিবার চেষ্টা করিবে ভাবিয়া আমি প্রস্তুত হইয়াছিলাম এবং যেমনি সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল অমনি তাহার টুট কামড়াইয়া ধরিলাম। শূকরটা অনেক ধস্তাধস্তি করিয়াও আমার কামড় ছাড়াইতে পারিল না। অবশেষে একটা গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া সে মরিয়া গেল। এই জন্মে আমাদের গর্ভ করিবার কিছুই ছিল না। ইহাতে সের আলিত মরিয়াই গিয়াছিল এবং আফজলেরও ডান পাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

বাড়ীতে গিয়া যখন আমরা সের আলির মৃত্যুসংবাদ দিলাম, তখন বাবা তো রাগেই অস্থির, “আমি কি তোমাদিকে সন্দেহই বলি নাই যে, বুড়ো বুনো শূকরের সঙ্গে বগড়া করিও না, ছোট ছোট শূকর মারা খুবই সহজ, কিন্তু তাহার গায়ের লোম ষটা হইতে আরম্ভ করিলেই আর

তাহাকে আক্রমণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। আমি নিজে এই শূকরটাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিতাম না।” একদিন আমি শিকার করিয়া ফিরিবার সময় একটা গোঁগানি শব্দ শুনিয়া এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে বাবাকে বন্দুকের গুলি খাইয়া একটা ঘোপের মধ্যে ছটফট করিতে দেখিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে, তোমার মা ও আফজল খাঁ উভয়েই শিকারীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। পরে আমাকে একটা দূরবর্তী জঙ্গলে বাইতে পরামর্শ দিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। যে জঙ্গলে আমি এখন আশ্রয় লইলাম, তাহা হরিণে পূর্ণ ছিল এবং আমি ৩৪ টি হরিণ প্রতিদিন মারিতাম। একদিন আমি একটা বেশ ছোটপুটে ঘাঁড় মারিয়াছিলাম, সেটা হরিণ ও শূকরের চেয়ে ঢের ভাল লাগিয়াছিল। ইহার পর হইতে আমি নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের গরু বাছুর ইত্যাদি মারিয়া খাইতাম।

একদা এক চাঁদনী রাত্রিতে পূর্ব-দিনের মারা ঘাঁড়টাকে খাইতে আসিয়া দেখিলাম যে, নিকটেই একটা মাচান বাধা রহিয়াছে। আমি যখন ঘাঁড়টাকে মারিয়াছিলাম, তখন মাচানটা সেখানে ছিল না। ইহাতে আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি তখন অভ্যস্ত আত্মনির্ভরশীল হইয়াছিলাম এবং ওদিকে দৃকপাত না করিয়াই খাইতে আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি দেখিলাম,

মাতানটার উপর একটা লোক বহিয়াছে। সে আমার দিকে একটা লাঠী বাড়াইয়াছিল। আমি পরে বুঝিয়াছিলাম সেটা লাঠি নয়, বন্দুক। সহসা একটা ভয়ানক শব্দ হইল এবং আমি মস্তকে আহত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি দেখিলাম একটা লোক বন্দুক হাতে করিয়া আমার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম যে, এক গুলিতে আমাকে মারিতে পারায় তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে। আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহার উরুদেশ কামড়াইয়া ধরিয়া বিড়াল ধেক্ষপ ইন্দুর ধরিয়া ঝাঁকুনি দেয় সেই-রূপে নাড়িতে লাগিলাম। যখন সে একেবারে অসাড় হইয়া গেল, তখন আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। আমার মুখে তাহার রক্ত লাগিয়াছিল, দেখিলাম যে তাহাতে একরূপ নূতন ধরণের আশ্বাদ। আমি নবন করিলাম মানুষটাকে খাইতে আরম্ভ করি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাবার উপদেশ মনে পড়িল ‘মানুষ কখনও খাইও না। মানুষ খাইলে মুত্ৰা অবশ্যস্বাবী’। বাবার কথা অনেক সময়েই ঠিক ঠিক ফলিয়াছে বলিয়া আমি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত মানুষটাকে খাইতে বিরত হইয়া ঝাঁড়টাকে খাইতে লাগিলাম।

ইহার পর অনেক বৎসর কাটয়া গেল। ইহার মধ্যে আমার এই জীবন-কাহিনীতে সন্নিবেশিত হইতে পারে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই

এই সময়ে সে দেশে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। গ্রাম্য লোকদিগের গরু বাছুর সব খাদ্যভাবে মরিয়া বাইতেছিল ও গ্রামবাসীরা নিজেরাও অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছিল। আমি তিন দিন কোনও রূপ খাদ্যের যোগাড় করিতে না পারিয়া নদীর ধারে একটা বোপের আড়ালে চুপ করিয়া শুইয়াছিলাম। এমন সময়ে গ্রামের স্তম্ভপোর মোটা বেনেটা সেই নদীর ধারে আসিয়াছিল ও আমাকে দেখিতে না পাইয়া গ্রাম আমার ঘাড়ের উপর পড়িয়াছিল। আমি মরিয়া বাইতেছিলাম, কিন্তু বাব দেখিয়া সে ভয়ে এমন জোরে তাহার হাতের লাঠির দ্বারা আমার মাথা আঘাত করিয়াছিল যে, সেই গুরুতর আঘাতে আহত হইয়া আমি আর আমার স্বাভাবিক ক্রোধ ও হিংস্র স্বভাবকে সংযত রাখিতে পারিলাম না।

ক্রোধে তাহার দিকে ফিরিয়া থাকা চালাইলাম। যদিও আমি বেশী জোরে থাকা মারি নাই, তবু তাহাতেই বেনের ঘাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। প্রথমে আমি তাহাকে খাইব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু দুদিন অনাহারে ছিলাম ও বেনে বেশ কষ্টপুষ্ট ছিল বলিয়া লোভ সামলাইতে না পারিয়া তাহাকে খাইতে আরম্ভ করিলাম।

ইহার পর হইতে আমার এক বিপদ উপস্থিত হইল। ভাল জিনিষের আশ্বাদ পাইলে মানুষের মুখে যেমন আর মন্দ

জিনিষটা রুচে না, সেইরূপ মানুষের মাংসের আবাদ পাইয়া আমার আর অভ কোন ক্ষতর মাংসে রুচি রহিল না । এক বৎসর যাইতে না যাইতেই আমি আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় ৫০ জন মানুষ মারিয়া ছিলাম । এই সময়ে আমার একটা শূগালের সহিত খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল । কারণ সে মানুষের মাংস খাইতে খুব ভাল বাসিত এবং আমার আহারাংশিষ্ট মাংসে তাহার বেশ চলিয়া যাইত । আমি দেখিয়াছি, মানুষের মধ্যে বড় লোকদের ছেলের নিকটে এই রকম কতকগুলি উচ্ছিষ্টভোজী পোষা বাস করে । শূগালের সহিত বন্ধুত্ব হওয়াতে আমার উপকারও খুব হইয়াছিল । যখনই আমাকে ধরিবার বা মারিবার জন্য গ্রাম-বাসীরা কোন আয়োজন করিত, তখন শূগালটা কাছে কাছে থাকিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আসিয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিত । সরকার বাহাদুর এই সময়ে আমাকে ধরিবার জন্য ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন । আমি তাহা শুনিয়া মনে মনে খুব আনন্দিত হইয়াছিলাম । শিকারীরা পুরস্কারের আশায় আমাকে ধরিতে অথবা মারিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমার বন্ধু শূগালের ধূর্ততার জন্য আমি সকল বিপদ হইতেই উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলাম ।

আমার এখন বোধ হয় যে, যদি

শূগালের সহিত আমি ঝগড়া না করিতাম, তাহা হইলে আজও পর্য্যন্ত নিম্নে জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইতে পারিতাম । একদিন শূগালটা আসিয়া আমাকে বলিল “হজুর! আপনি গত সপ্তাহে যে কাঠুরিয়াটাকে তাহার ঘরে ঢুকিয়া মারিয়াছিলেন, তাহার কথা মনে আছে ত? তাহার স্ত্রী দুইটা ছেলে লইয়া এখনও সেই ঘরেই বাস করিতেছে । দরজার একপাশে অবস্থা যে, আপনি একটু ঠেলা দিলেই পড়িয়া যাইবে ।” আমি বলিলাম “বেশ তা আজ রাত্রিতে সেই-খানেই শিকার করা যাইবে ।” আমরা কাঠুরিয়ার বাড়ীর নিকটে গিয়া দরজার ফাঁক দিয়া দেখিলাম যে, কাঠুরিয়ার স্ত্রী খাবার প্রস্তুত করিয়া তাহার ছেলে দুটিকে খাইতে দিতেছে । বড় ছেলেটি এক পানা বাশ-কাটা দা লইয়া বলিল “আমি বড় হলে বাবার মত কাঠুরিয়া হইব । আচ্ছা মা! বাবা কোথায় গিয়াছেন? কবে আসিবেন?” এই কথা শুনিয়া স্ত্রী-লোকটা কাদিতে কাদিতে বলিল “তিনি আর কিরে আসবেন না! তবে একদিন আমরা সকলে তিনি যেখানে গেছেন, সেইখানেই যাবু” অতঃপর দুইজনা করিয়া “তিনি কেন চলে গেলেন? তিনি কি এখানে সুখী ছিলেন না?” ইহাতে স্ত্রীলোকটা মুখচাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাদিতে লাগিল । সেই মুহূর্ত্তে আমি এই সব দরিদ্র লোকদিগকে কত কষ্ট দিয়াছি তাহা সর্বপ্রথম বুঝিতে

পারিলাম। সহসা আত্মগোপন ও অসুস্থতাপে
 পুড়িতে পুড়িতে আমি মনে মনে ভাবিলাম,
 আর আমি মাহু মারিব না। এমন সময়ে
 শূণালটা বলিল “হুজুর আর বিলম্ব করিতে-
 ছেন কেন? ছেলেটাকে দেখতে আমার
 জিবু দিয়ে জল পড়ছে।” আমি বলিলাম
 “হুজুরা পেটুক দূর হ। আমি আর
 কখনও মাহু মারিব না।” শূণাল এই
 কথা শুনিয়া রাগিয়া সেখান হইতে চলিয়া
 গেল। আমিও তাহার পিছনে পিছনে
 চলিয়া আসিলাম। কিছু দূরে এক স্থানে
 পাছের পাতা খুব বন করিয়া ছড়ান
 রহিয়াছে দেখিলাম। দেখিয়াই সেটা
 যেন কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ
 হইল। আমি ফাঁদ আছে সন্দেহ করিয়া
 দাঁড়াইলাম। কিন্তু শূণাল আমার এই ভয়
 দেখিয়া অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গী করিয়া নির্ধিমে
 সেই পাতা-তাকা স্থানটার উপর দিয়া
 চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া আমিও তাহার
 অনুসরণ করিলাম। কিন্তু অল্পেক দূর
 যাইতে না যাইতেই বনাং করিয়া একটা
 শব্দ করিয়া হুজুরকলের মত দাঁতওয়ালা
 দুটা প্রকাণ্ড লোহার মুখ লাফাইয়া উঠিয়া
 আমার সম্মুখের ডান পাটা কামড়াইয়া
 ধরিয়াছিল। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও
 নিজের সে পাটা মুক্ত করিতে পারি
 নাই। শূণালটা বোধ হয় জানিত যে,
 তাহার ক্ষুদ্র শরীরের ভায়ে ফাঁদটা খুলিয়া
 যাইবে না এবং সেই জন্যই সে সাহস করিয়া
 তাহার উপর দিয়া গিয়াছিল। এখন সে

আমাকে বলিল “হুজুর এ ফাঁদটার বিষয়ে
 আপনাকে আমি সাবধান করিয়া দিতে
 পারিতাম, কিন্তু ‘হুজুরা পেটুক’ বলিয়া
 আপনার মত মহৎ লোককে কোন কথা
 বলিতে সাহস করি নাই।” এই বলিয়া
 সে চলিয়া গেল। সে রাতি আমি যে
 যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহা অসহ্য। তবু
 তখনও আমি মনে মনে ইহাও আশা
 করিতেছিলাম যে, সকাল হইলে মাহুয়ের
 আসিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিয়া আমার
 সকল কষ্টের শেষ করিয়া দিবে। কিন্তু
 সকালে মাহুয়ের আসিয়া আমার সাধারণ-
 ব্যায়হুজু প্রকাণ্ড শরীর দেখিয়া
 আমাকে না মারিয়া একটা প্রকাণ্ড
 লোহার গরাদে যুক্ত প্রকাণ্ড পিজার মধ্যে
 বন্দী করিল। পরে আমাকে গরুর
 গাড়ীর উপর করিয়া এবং অবশেষে
 খুব ক্রতগামী রেলগাড়ীতে চড়াইয়া এখানে
 আনিয়া রাখিয়া দিয়াছে। এখানে সিংহ,
 নেকড়ে বাঘ, চীতা বাঘ, হস্তী, ভল্লুক
 প্রভৃতি জন্তু বন্দী আছে দেখিতেছি।
 ইহারাও হয়ত এক দিন বনে বনে আমার
 মত শিকার করিয়া বেড়াইত। এখন
 যেখানে আনিয়াছে লোকে তাহাকে
 চিড়িয়াখানা বলে। আমার এখানটা
 মোটেই ভাল লাগে না। তবে স্থলের
 বিষয় এই যে, আমাকে আর বন্দী দিন
 বাঁচিতে হইবে না। মরিলেই আমি
 এখন বাঁচি।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ভারত-সম্রাটের প্রতিগমন।

এসেছিলে তুমি ভারত-সম্রাট,
পদে পদে আবার চলিলে ফিরিয়া,
দেখিলে ভারতে পথ ঘাট ঘাট
তোমারে দেখিয়া উঠিল মাতিয়া।

দেখিলে ভারতে জিশ কোটা নর,
দেখিলে তোমারে দেখিয়া সকলে
ভুলিয়া উচ্ছ্বাসে কোটা কণ্ঠস্বর
গাইল তোমার সুবশ সকলে।

বাল, বৃদ্ধ, বুঝা, পুরাঙ্গনা যত
তোমারে দেখিতে আসিল ছুটিয়া,
পথের ভিখারী, অন্ধ খঞ্জ কত
উঠেছিল তারা আনন্দে মাতিয়া।

যেতেছ চলিয়া যাওহে নৃপতি,
মনে রেখ চির ভারতের কথা,
মনে রেখ চির-রাজভক্ত জাতি
গাবে চিরদিন তোমার বারতা।

মনে রেখ শ্রুতি ভারতনারীর,
মনে রেখ তুমি তাহাদের কথা,
মনে রেখ তারা মহিলা "মেরার"
শত মুখে গাবে বশোত্ত-গাথা।

পরানীনা নারী গাবে তবু তারা
গৌরব তোমার শত কণ্ঠে সবে,
সাহিত্য বিধবা—মুখে নাহি সাড়া,
তারাও তোমার বশোত্ত গাবে।

দেখিও তাদের বলি হে নৃপতি,
দেশাচারে তারা সদাই দলিত,
দেখিও তাদের চিরজুখী জাতি
দেখিও তারাই চির নিখোঁত।

শিথেনি ভারত এখনো শিথেনি,
নারীর মর্যাদা এখনো বুকে না,
তাই রেখ মনে—ভারতরমণী
তোমারে কখন ভুলিয়া রবে না।
শ্রীগৌরী প্রসাদ মজুমদার।

নূতন সংবাদ।

১। আমেরিকার সিকাগো নগরে হুঃহু
ও রুম কবিদিগের কল্প একটি আশ্রম
নির্মিত হইতেছে। যে সকল কবি এক
সময় কবিতা-রচনা-মৈপুণ্য দ্বারা খ্যাতি

লাভ করিয়াছেন, তাহারা রোগাক্রান্ত
হইয়া নিরুপায় হইলে তাহাদিগকে ঐ
আশ্রমে আশ্রয় প্রদান করা হইবে।

২। বিগত ম্যাট্রিকুলেশন ও ইন্টার-

মিডিয়েট্ পরীক্ষার নিয়মিত ছাত্রী
দুইটা বিশিষ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জ্যাটিকুলেশন পরীক্ষা।

প্রিয়নাথ দত্তবৃত্তি।

জ্যোতিষ্মদী বোব—কটক মডেল

বালিকা বিদ্যালয়।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা।

প্রিয়নাথ দত্তবৃত্তি।

ফেমদা রায়—বেণু কলেজ।

৩। মহীশূর গবর্ণমেন্ট ঘোষণা
করিয়াছেন যে, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা
জানুয়ারী হইতে বাজালোর, মহীশূর,
হাসান, শিমোগে, কোলার, তুমকুর, চিতল-
ঙ্গু ও কাডুর নগরে বালকদিগের ধূম-
পান-নিষেধক আইন আর হইবে।

৪। এইবার করাচী বন্দরের বণ্টন

উন্নতি হইবে। ইহার আয়তনও বর্ধিত
হইতেছে। ইংাই দিল্লী রাজধানীর বন্দর
হইবে।

৫। দেখিতে দেখিতে আবার ইংল্যান্ড
১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ আমাদিগের নিকট হইতে
বিদায় গ্রহণ করিয়া অনন্ত কালজলদি-
বক্ষে ধীরে ধীরে বিলীন হইল। নানা
কারণে এই একটি বহুকাল আমাদিগের
চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিবে। তথাপি
ভারত সম্রাটের শুভাগমন, বঙ্গদেশ
নিরাকরণ ও রাজধানী পরিবর্তন, এই গুলি
প্রধান। ইটালী ও তুরস্কের সৈন্য,
চীনরাজ্যের মহাবিপ্লব, পাকিস্তান রাজ্যের
রাজনৈতিক ছরবছা প্রভৃতি ঘটনার
জনাও ইহা জগৎবাসীর অরণীয়
থাকিবে।

বামারচনা।

রাজ-অভ্যর্থনা।

(১)

হইল ভারত-গগন উজল

তরুণ অরুণ-কিরণে আজি,

নিশি অবসানে আসিল দিবস

মনোহর বেশে, আজি গো সাজি।

(২)

ওকান মুকুল ছুটিল আবার

মধুর প্রভাতে শিশির-মাথা;

গুঞ্জরে ভ্রমর আঁধারে গোহাগে

কেটা ফুল' পরে কাপারে শাখা।

(৩)

মঙ্গল সঙ্গীত গাহিছে মধুর

কোকিল পাখিয়া কাঁপারে শাখা,

বহিছে ভটিনী উল্লাসে মাতিয়া

সৈকতে আঁকিয়া রঙ-রেখা।

(৪)

ভারতের আজি বড় শুভ দিন,
এলেন নূতন ভূপতি ধারে,
দুঃখিনীর আজি ত্রুণ যুচাইতে
বতনে মুছাতে নয়নধারে।

(৫)

এস মহারাজ! এস মহারানি!
দীনা অভাগিনী তনয়া-বাসে,
কত মাস, বর্ষ, বৃথা, যুগান্তর
ভরিত রাচিত আপন পাশে।

(৬)

পিতা মাতা তার দেখিতে বারেক
এগেছেন যদি কৃপা বরদণে,

এত দিনে অশা মিটল তাহার
এস রাজা রাজ! তারি ভবনে।

(৭)

মণিন বদনে ফুটেছে যে হাসি
তোমারি দরায় এ শুভ দিনে,
কৃতজ্ঞ ভারত গণপুত্র আজি গো
নমে মহারাজ, তোমারি চরণে।

(৮)

এস মহারাজ! এস মহারানি!
সঙ্গিন ভবনে লইতে পূজা,
ত্রিশ কোটি কণ্ঠে গাহিছে উচ্চাসে
“জয় মহারানি! জয় মহারাজা!”
ঐমতী স্নেহশীলা চৌধুরানী।

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।

(১)

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।
উপরে মেঘের স্তব, মৃদু ছায়া তার পর,
রবির রক্তিম আভা তার।

২

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।
বাতাস আর বহে না কি যেন শুরু হয়ে রছে,
ক্ষীণা নদী ধীরে বয়ে যায়।

(৩)

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।
ভরণী উপরে নেয়ে কি স্রূরে উঠিছে গেয়ে
পর্যণ টানিছে যেন তার।

(৪)

সলিলে রক্তিম। মেখে, প্রকৃতি দিরাছে
একে,

বিশাল আকাশপট তার।
শাশ্বির কোমল ছায়ে ওপারে আমল ভূঁয়ে
মাথামাথি লগ্ন্য পাতার।
আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।

(৫)

তরুকোলে রাধি মাথা, ব্রতভী কহে কি
কথা,

কোকিলা আপন মনে গায়,
শ্রাব সন্ধ্যা ধীরে এসে, দাঁড়ায় ধরার পাশে,
টুলে টুলে ফুল পড়ে গায়।

(৬)

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।
হুটি মেয়ে নদীতীরে চাহিয়া রয়েছে মোরে
অঞ্চল উড়িছে ধীরে যায়।

হাসি হাসি রূপা মুখ, অনয়ে নাহিক দুখ,
বিবাদ ভাবনা নাহি তার।
সুদূরে আকুল স্বরে কে যেন ডাকিছে কারে,
কাছে এসে বাড়ে ভেসে যায়।
আজ প্রাণ কি জানি কি চায়।

(৭)

আজি দিবা অবসানে, কাহারে বা পড়ে
মনে,

পরশ ছুটিয়া কেন যায় ?
কে কি বলে কাণে কাণে,
বায়ু কারে ডেকে আনে
করিবারে পাশলা আদায়।

(৮)

কুল কেন ভাসে চেউয়ে, পাখী কেন উঠে
গেয়ে,

কেন তরী ব'য়ে যায়।

নদী কেন বহে বীরে, ছায়া কেন পড়ে নীরে,
মান রবি লক্কণ চায় ?

(৯)

ভূমি বিশ্ব একা একা, চাহে প্রাণ কার দেকা,
হিয়া ঢাকা তীর বাসনা।

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।

শ্রীমতী প্রিয়বালা স্মার,
মহকুমা মানিকগঞ্জ, জেলা ঢাকা।

রাজসূর-যজ্ঞ।

আজি বহু যুগ-যুগান্তর পর,
ইউরোপ হ'তে ইংলণ্ড-ঈশ্বর,
প্রথম আসি এ ভারত-ভূমে,
মহাজ্ঞানী সহ ভারত-সম্রাট—
রাজসূর যজ্ঞ মহান্ বিরাট—
করিছেন স্তম্বে বিপুল ধূমে।।

যেখানে স্থাপনে রাজসূর যজ্ঞ
করেছিল রাজা পাণ্ডব ধর্মজ্ঞ,
সেই দিল্লী ধাম হস্তিনাপুরে
ভারতবর্ষের দৌলভাগ্যে আবার,
পঞ্চম-জর্জের এ যজ্ঞ ব্যাপার
হতেছে কতই বরষ যুগে।

নিজাম, বরদা, ভোট, পাতিয়াল,
কাশ্মীর, মিজিয়া, বেগম ভোপাল,

যোধপুর-ভূপ, কাশীর রাজ।
বিকানীরপতি, রাণা উদয়পুর,
অয়োধ্যা-নবাব, রাজা ত্রিবাঙ্কর,
করেছেন সবে কুর্নিশ আজ।

ধন্য ভাগ্যবান! ধন্য মহারাজ!
অধিতীয় তুমি একছত্রী আজ,
সমকক্ষ তব লগতে নাই।
যত রাজা রাণী, নবাব-বেগম,
দিতে রাজকীয় উচিত সত্ৰম,
সমাগত সবে এ যজ্ঞে তাই।

ভারতীর প্রজা মোরা সর্বজনে,
নভিশিরে রাজদম্পতীচরণে,
ভক্তি-অর্থ দিহু অঞ্জলি ভরি।
আমরা কেবলি এই প্রব জানি,

রাজা নারায়ণ, নারায়ণী রাণী,
জাতি ধর্ম্য আদি কিছু না ধরি।
দাগরে কামান, দাগ গোলন্দাজ !
হুড়ুন্ হুড়ুন্ হোক আওয়াজ,
দেখুক সর্বত্র সকল জন।
সম্রাটেরে রাজ-চক্রবর্তী বলে
মানিতে হাজির এই বজ্রহলে,
রাজভক্ত যত প্রকৃতিগণ।

উড়াও রে পতাকা, পতাকাবাহী।
দেখুক সকলে সবিস্ময়ে চাহি,
একই রাজার নিশান-তলে,—
হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান,
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মী জাতি সে নানান
সম্মিলিত সবে সদল বলে।

যত বাজকর ! বাজা স্রুথে আজ,
ঢাক, ঢোল, কঁাশী, সেতার, এস্রাজ,
শলিত সামাই, মৃদঙ্গ, ভেরী।
—সুরে জয়ধ্বনি উঠুক বিরাট,
জয় “পঞ্চম জর্জ” জয় সম্রাট !!
জয় ভারতের সম্রাজ্ঞী “মেরী” !!

বাজাও বুটিশ বাজকরগণ !
সম্রাটেরে সযনে বুটিশ বাদন,
হইয়ে সকলে প্রফুল্ল-প্রাণ।
ভারতবাসীর প্রাণের প্রার্থনা,
বুটনের গতে বাজাও বাজনা
“গড্ সেভ্ দি কিং কুইন্” গান।
শ্রীমতী সুনীলা সুনন্দী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

সম্রাট আগমনে।

নিজে দর বিলাইতে,
প্রজা-অঞ্জ মুছাইতে,
আসিয়া ইংলণ্ড হতে
করিলেন মঙ্গল-ঘোষণ।
করে লয়ে রাজাভার,
পার হয়ে পারাবার,
ভাজি পুরি আপনার
আসিলেন ভারতরঞ্জন।
উঠালেন বঙ্গোদর,
ঘুচালেন মন-খেদ,
রাজরাণী সত্যবেদ
রেখো নবে যতনে স্মরণ।

পচক্ষে দেখিল নর
ভিক্টোরিয়া বংশধর
হয়েছেন দণ্ডধর
শিরে ধরি মুকুট ভূষণ।
ভেবে দেখ আগে পাছে,
তীরে দিবে কিবা আছে,
হৃদিভরা ভক্তি কাছে
ধরামাঝে নাহি কোন ধন।
ভারত সোণার ধনি,
বহু-রত্ন-প্রসবিনী,
উঠগো দরিদ্রা ধনি,
লহ তাঁরে করিয়া বরণ।

সত্রাট মহিষী সঙ্গে,
 রোম করি বঙ্গভঙ্গে,
 আসিছেন দীন বঙ্গে
 দাও ভক্তি বিমিত্তধন।
 সম্মান সমান প্রজা
 পালিও যতনে রাজা,
 দেশে দেশে শুকা হাজা
 বার্থ করে রাজ-আগমন।
 রাজার করুণা আশে
 দাঁড়াইয়া পথপাশে
 জানাতে রাজসকাশে
 সকলের মনের বেদন।
 পাইবে অস্তর বাণী
 মনে ছেন অহুমানি
 দীন দ্রবী বত প্রাণী
 সবে আজি আনন্দে মগন।
 পাণ্ডব গৌরব যথা

রাজস্বয় যজ্ঞ তথা
 হুমেছিল, সে বারতা
 কে না জানে মাঝে জিতুবন।
 অহুসরি সে কাহিনী
 ইন্দ্রপথে রাজধানী
 আদেশিলে গুণমণি
 ভিত্তি তার করিলে স্থাপন।
 উদার রাজা মহান্
 করুন ছেন বিধান,
 বেন অন্ন-সংস্থান
 করিবারে পারে প্রজাগণ।
 শিজোন্নতি যাতে হয়
 বাণিজ্য জগম হয়,
 কণো রাজা সদাশয়
 যুক্ত করে এই নিবেদন।
 শ্রীমতী সুরেশ্বরী দেবী।
 ১৮৮৪, অক্টোবর দ্বিতীয় গতি।

১৮৮৪ নং মধুরার লেন, ইন্ডিয়ান প্রেসে শ্রীমদলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

ও

শ্রীমদ্রোহ কুমার দত্ত কর্তৃক ৯ নং আটনিবাগানে লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 582.

“স্বাধীনতা পত্রিকা”

কলিকাতা ও পালন করিবক ও বহুর সহিত শিক্ষা দিবক

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. কর্তৃক প্রবর্তিত।



৪৯ বর্ষ।
৫৮২ সংখ্যা।

মাঘ, ১৩১৮।

৯ম কল্প।
৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজার জন্মদিন—আগামী ৩রা জুন ভারতবর্ষে সম্রাটের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইবে।

রাণীর দান—ভারত সম্রাজ্ঞী যখন কলিকাতার আসিয়াছিলেন, তখন তিনি শেভী ডকারিং ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে দশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গের সীমা নির্ধারণ—এইক্ষণ শুনা যাইতেছে যে, লর্ড ক্রু বলিয়াছেন, আপাততঃ বঙ্গ ও বিহারের সীমা নির্ধারণ করা হইবে না। প্রমাণাদি সংগৃহীত হইলে কোন্ জেলা কোন্ প্রদেশে থাকিবে, তাহার নির্ধারণ করা হইবে।

বোম্বাইয়ের তুলা—এবারও বোম্বাইয়ে তুলা ভাল জন্মে নাই। গত বৎসরের তিন চতুর্থাংশ ভূমিতে তুলার চাষ করা হইয়াছিল, কিন্তু গত বৎসরের অনেক তুলাও হয় নাই।

সিভিল সার্জন্স পরীক্ষা—এবার ভারতীয় সিভিল সার্জন্স পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ

বার জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন মাত্র বাঙ্গালী ও দুইজন পার্শী। বাঙ্গালী ছাত্রের নাম জ্যোতিষ চন্দ্র দে। ভারতীয় ছাত্রগণ পরীক্ষায় ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ১০ম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

নারীর অধিকার—এলাহাবাদের বারিষ্টার পণ্ডিত মোহনলাল নেহরুর পত্নী মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের পদপ্রার্থিনী হইয়াছেন। নারীগণ দেশের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিলে দেশের উন্নতি দূর হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিকেল সিনেট সভাকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডি, সি কিসটকে পি এইচ, ডি ও ডাক্তার জে, সি বহু ও মিঃ ক্রলকে ডি, এস সি উপাধি প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

নূতন-দীল্লি—শুনা যাইতেছে, নূতন দীল্লি নিৰ্ম্মাণ করিবার জন্ত লিবারপুলের

সিটি ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ব্রাডির আসিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কার্যালয় ও আবাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্য পূর্ববঙ্গের সিভিলিয়ান মিঃ এইচ, কে, ব্রিস্কো ও বুক প্রমোশ্যের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এ, এম, কুস নিযুক্ত হইয়াছেন।

কেরোসিন তৈল—ইদানীং এদেশে কেরোসিন তৈল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্বে রেডি প্রভৃতি যে সমুদায় তৈল দীপাদি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত, কেরোসিন তৈল এক্ষণে তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাতে আলোকের ওজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু বহু অনিষ্টেরও উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার দূর্গন্ধ ও তীব্র উত্তাপ গৃহস্থকে সহ্য করিতে হয়। সময় সময়ে ইহাও দূর হইয়াছে, যে রাত্রিতে গৃহের মধ্যে কেরোসিনের অ্যাপ্প জালিয়া দার রুদ্ধ করিয়া গৃহস্থ

নিদ্রিত হইয়াছেন এবং শান্তকালে দার উদ্ঘাটিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার বিষাক্ত গ্যাসে গৃহস্থের ও পরিবারবর্গের প্রাণবায়ু বহিস্কৃত হইয়া গিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে গত ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত কলিকাতা সহরে মোট ৭,৯২, ৩৫, ০০০ (সাত কোটি বিরানব্বই লক্ষ পঁইত্রিশ সহস্র) গ্যালন কেরোসিন তৈল আমদানী হইয়াছে।

লর্ড কারমাইকেল—মাস্তাজবাসিগণ লর্ড কারমাইকেলকে ছাড়িতে চাহিতেছেন না। তিনি স্বকীয় উদারতার মাদ্রাজবাসীদিগের চিত্র অধিকার করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, লর্ড কারমাইকেলকে যাহাতে মাস্তাজে রাখা হয়, তজ্জন্য মাস্তাজবাসিগণ সত্ৰাট ও ভারত সচিবের নিকট একখানি আবেদনপত্র পাঠাইতে সক্ষম করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকের কাজ ।

বিত্তীয় মানসিক কাজ। পুস্তক রচনায় শিক্ষকতা অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞা ও জ্ঞানের আবশ্যক। আগের বর্তমান অবস্থায় উহাতে বিশেষ উপার্জনেরও আশা নাই। তথাপি শিক্ষিতা নারীমাদেরই ঐ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। পুরুষেরা কিম্বা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ? কিরূপ গভীর চিন্তা ও অনুশীলন দ্বারা তাঁহারা এতদধিক জ্ঞানী হইয়াছেন ? কি প্রকার পুস্তক লিখিয়া তাঁহারা আমাদের মধ্যে

জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন ? এই সংসার কিরূপে ও কোন্ নিয়মে চলিতেছে ? মানব প্রকৃতি এ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কেন ? পুত্র পক্ষী ও অন্যান্য বাহ্য জগতের সঙ্গে মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ কি ? ইত্যাদি গুরুতর বিষয়গুলি সন্দর্ভা সম্মুখে রাখিয়া তাহার চিন্তা ও আলোচনা করিলে মন প্রশান্ত হইবে এবং মন অপেক্ষাকৃত শশস্ত হইলেই উহাতে নূতন নূতন ভাব প্রবেশের সম্ভাবনা। সেই সকল

নূতন ভাব ধরিয়া কাগজে লিপিবদ্ধ করিলেই প্রবন্ধ বা পুস্তক হয়। সুতরাং ভাবসম্পদের পূর্বে শুধু কাগজ কলম লইয়া আমরা যদি পুস্তক লিখিতে বসি, তাহা হইলে আমাদের লেখনী হইতে নিজের মৌলিক ভাব বাহির না হইয়া অপরের গ্রন্থ হইতে অপছন্দ ভাব, কিংবা অতি অসংলগ্ন ভাবহীন লেখা বাহির হইয়া পড়িবে। আর এক্ষণে অনাবশ্যক পুস্তকের জন্য আমাদের নিজের ও পরের কাছে সর্বত্রই উপহাস সহিতে হইবে। সে জন্য ভাল পুস্তক লিখিয়া সফল হইবার ইচ্ছা করিলে বরষা একটু প্রবীণ ও বুদ্ধি সুপক হইলেই ভাল হয়। তথাপি যৌবনকাল হইতে উহার চেষ্টা করাতে কোন ক্ষতি নাই। উত্তম সারগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়নে কৃতকার্য হইবার জন্য বথাসাধ্য ভাল ও গভীর জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ পাঠের জায় সঙ্গপকরণ আর কিছুই হইতে পারে না। আমাদের সমুদয় বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে রত্ন সকল সংগ্রহ করিতে যিনি অক্ষম, তাহার পক্ষে পুস্তক লেখা কার্যে হাত না দেওয়াই শ্রেয়। কিন্তু যে নারীর চিন্তা ও কল্পনাশক্তি প্রবল, সদগ্রন্থ পাঠে তাহার মনে নানা নব নব ভাবের আবির্ভাব হইবে আর সেইরূপ বুদ্ধিমত্তী ও চিন্তাশীলার মণিরই সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্ণমনোরণ হইবার সম্ভাবনা। অল্প দিকে পাঠ্য পুস্তক লিখিতে বা অনুবাদ করিতে হইলে সারগর্ভ গ্রন্থ রচনার জায় তত গভীর চিন্তা ও

কল্পনার আবশ্যক হয় না। স্বাভাবিক বিচারশক্তি, মনোভাব প্রকাশের শক্তি, ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা থাকিলেই, উহাতে অনেকটা কৃতকার্য হওয়া যায়। সেই জন্য, বালিকা ও শিশুদের জন্য পাঠ্য পুস্তক লেখার কাজ যে আজকাল দুইচার জন সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারেন, একথা বড় অসঙ্গত বোধ হয় না। শিশুদিগের সঙ্গে নারী জাতির অধিকতর ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষ বলিয়া পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগের অভাবাদি বুঝিতে অধিকতর সক্ষম কারণ কালেই, উহাতে প্রয়াস পাইলে ইংরাজ প্রদ্যক্সী-দিগের জায় হিন্দু মহিলারাও যে সফল হইবেন, এইরূপ আশা হয়। অবশ্য, তাহার কল্পনাপুস্তক লিখিবেন, বা কি প্রকারে লিখিতে আরম্ভ করিবেন, তাহা বলা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব। কিন্তু তাহাদের উপার্জন গ্রন্থের ভাল ফল শুণের উপর নির্ভর করিবে। তদে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, স্ত্রীলোকেরা নিজদের বিজ্ঞাবুদ্ধি চালাইয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিলে উহাতে সফল হইবার অধিক সম্ভাবনা আছে। শিক্ষয়িত্রী ও গ্রন্থ-কর্তার কার্য বাস্তবিক ডাক্তার ও ধার্মিক শ্রুতি আরো দুই চারটা মানসিক কার্যে প্রবেশের অধিকার এখন মহিলাদিগের অধীন। আমাদের দেশে অস্ত্রপূর-প্রথার ব্যবস্থা বশতঃ আর আমার মতে, জেমানা রীতি না থাকিলেও নারীজাতির পীড়ার জন্য সকল দেশেই মহিলা



ডাক্তারের একান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ ভ্রূবংশীয় হিন্দু মহিলাদিগের নিমিত্ত স্ত্রী-ডাক্তারের যে কত প্রয়োজন, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। এখন আমাদের দেশে অনেক ইংরেজ ও আমেরিকান স্ত্রী ডাক্তার আসিয়া নারীদিগের চিকিৎসা দ্বারা বিলক্ষণ উপার্জন করেন। তবে এরূপ গৌরবজনক ও উপকারী কাজে হিন্দু মহিলাগাই বা উদ্যোগী থাকিবেন কেন? স্বথের বিষয়, কয়েক জন ভারতনারী এক্ষণে চিকিৎসা কার্যে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু দশ বার কোটী স্ত্রীলোকের মধ্যে অল্প কয়েক জন স্ত্রী-ডাক্তারে কি করিবেন? স্ত্রী-ডাক্তার দ্বারা আমাদের দেশীয় মহিলাদিগের প্রকৃতরূপে চিকিৎসা করা হইতে হইলে আরও কত স্ত্রী-ডাক্তারের আবশ্যক। সুতরাং যেনারীর শিবিবার অবসর ও সজ্জি আছে, তিনি যেন বুধা গজ্জার বশবর্তী হইয়া উহাতে

নিযুক্ত না থাকেন, এই আমার প্রার্থনা। আর তাঁহারা যদি ভ্রূভাবে ও সদাচারে থাকিয়া এই মহৎ কার্যে কৃতকার্য হন, তাহা হইলে হিন্দু অভিব্যক্তিগণ আর কখনও উহাতে আপত্তি করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ আজ কাল অনেক স্থানে স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞান হ্রাসপাতাল হইয়াছে, অতএব পুঙ্খবহিগের সমুখে বা সাধারণ স্থানে বাহির না হইয়া ও স্বচ্ছন্দে স্ত্রীলোকের মাঝে থাকিয়া স্ত্রী ও শিশুদিগের উপযোগী চিকিৎসায় পারদর্শিনী হইতে পারা যায়। এক্ষণে ধাত্রীবিজ্ঞা ও ভ্রূনারীদিগের পক্ষে লাভজনক হইয়াছে। আর উহার জ্ঞান শিক্ষা ও আপেক্ষিক ব্যয় সহজ ও অল্প বলিয়া উহা অনেকেরই সাধ্যায়ত্ত। ভাল ধাত্রীর অভাবে ভারতবর্ষে যে কত জননী ও শিশু অকালে কালকবলে পতিত হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

গৃহ-শিক্ষা।

বালাবস্থায় গৃহই বালকবালিকাদিগের একমাত্র শিক্ষাস্থল। শৈশবে স্বাভাবিক অতিশয় প্রবৃত্ত থাকে, ঐ সময়ে পিতৃমাতৃ-সন্নিধানে মাতৃষের বাহা শিক্ষা হয়, সমস্ত জীবনেও তাহা কেহ বিস্মৃত হইতে পারে না।

গর্ভ, সঞ্চার হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সন্তানের প্রতি জনক জননীর কঠোর কর্তব্য ও দায়িত্ব

চিরদিনই আছে। অপরিণতবয়স্ক সন্তানের প্রতি যেরূপ পিতামাতার সমধিক স্নেহ ও বাৎসল্য থাকে, বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের প্রতিও তদ্রূপ। তবে বয়োভেদে ইহার কিঞ্চিৎ তারতম্য হইয়া থাকে মাত্র। সে তারতম্য এই যে, বাল্যে সন্তানগণ পিতা মাতার আয়ত্তাধীন থাকে এবং পরিণত বয়সে তাঁহাদিগের আয়ত্তের বাহিরে গদ্যপণ করে। এই জ্ঞান ঐ সময়ের



শিক্ষাও তেমন ফলপ্রসূ হয় না। এই কারণেই বোধ হয় জ্ঞানী মহাত্মাগণ বালা কালকেই শিক্ষার উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

কিন্তু সেই শিক্ষা কাহাকে বলে? অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, কেবল মাত্র বিজ্ঞানশিক্ষাকেই আমরা শিক্ষা বলিতেছি, তাহা নহে; কেবল মাত্র বিজ্ঞান শিক্ষাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির মধ্যে ঐক্লপ শিক্ষা কোন ক্রমেই মঙ্গলদায়ক নহে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কোন শ্রেণীর মধ্যেই কোন কালে এবং কোন অবস্থাতেই শুদ্ধ পুণ্ড্রিগত বিদ্যায় মহাশাসমাজের ও জগতের কোন উপকারই সাধিত হয় নাই। যে সকল মহাপুরুষ এবং অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন পুণ্যবতী নারী স্ব স্ব মহীয়সী শক্তি দ্বারা এ জগতের নীর্থস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কি কৰ্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জনহিত ও বিখ্যতি করে জীবন উৎসর্গ করেন নাই?

শৈশবে ধর্মশিক্ষা ও সদৃষ্টান্ত দ্বারা সম্মানদিগের চরিত্র গঠন করা জনক জননীর প্রধান কর্তব্য। ঐ সময়ে চরিত্র গঠিত না হইলে আর কোন কালে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। ইতিহাস আবহমান কাল ধরিয়া উজ্জলরূপে তাহার সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে। এক দিকে বিদ্যার্ণব মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তাঁহার যথেষ্ট চারিতা ও উজ্জ্বল চরিত্রের বিষয়

চিন্তা কর; পক্ষান্তরে দেখ, বর্ণজ্ঞানহীন সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাজ্ঞে ও উজ্জল ধর্মপ্রভায় আজি জগৎ উদ্ভাসিত এবং ভারত গৌরবাবৃত। সুতরাং ধর্মশিক্ষাকে কোন ক্রমেই অবহেলা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। শৈশবে মানবজন্মে যে সকল বীকের প্রথম অঙ্কুর হয়, পরিণতাবস্থায় তাহার বিকাশ হয় মাত্র। বস্তুতঃ বাল্যে যাত্নাদিগের জন্মে ধর্মভাব, কর্তব্যজ্ঞান, দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, ঐদার্য্য, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি সদ্বৃত্তিসমূহের উদ্ভাবনা না হয়, উত্তরকালে তাহাদিগের ঐ সকল গুণে অলঙ্কৃত হইয়া জনসমাজে প্রাধান্য লাভ করা কদাচ সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই সকল শিক্ষা ও সম্ভাবসমূহের ভিত্তি-স্থল যে একমাত্র শিশুগণের গৃহে জনক জননী, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। একটা সদৃষ্টান্ত দ্বারা যে শিক্ষালাভ হয়, চিরদীর্ঘন ধরিয়া অজস্র মৌখিক উপদেশে তাহার শতাংশের একাংশও হইবার সম্ভাবনা নাই। গৃহে আমরা পুরুষজাগণকে প্রতিনিয়ত অসং দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি অথচ সুখ তাহাদিগকে সং হইতে উপদেশ দিতেছি, ইহা অপেক্ষা অবিমুগ্ধকারিতা ও হাষ্ঠাপ্পদ বিষয় আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ আনন্ড বুক রোপণ করিয়া আমরা যেমন তাহাতে স্মৃষ্টি আশ্রকলের আশা করিতে পারি না, তদ্রূপ কোপনস্বভাব দান্তিক, চরিত্রহীন পিতা মাতার সম্মানগণকেও আমরা মহাবোচিত উৎকৃষ্ট

শ্রবণমুহে ভূষিত দেখিতে কদাচ আশা করিতে পারি না। যে দেরূপ আশা করে, তাহাকে উন্মাদরোগগ্রস্ত ভিন্ন আর কি বলা বাইতে পারে? অনেক পিতা মাতা এরূপ আছেন যে, বালকবালিকাগণ ছুটা-ছুটি করিয়া খেলা খুলা করিবে, ক্ষুর্তির সহিত স্বাদীনভাবে বাক্যালাপ ও গমনা-গমন করিবে, কিম্বা দরপারবশ হইয়া কাহারও কোন সাহায্যে অগ্রসর হইবে, ইহা তাঁহাদিগের নিকট একবারেই অসহনীয়। কেহ কেহ ঐ সকলকে নিতান্তই দু'বা মনে করেন এবং ক্রোধ-পরবশ হইয়া প্রহার ও নানারূপ নিৰ্যাতন দ্বারা শিশুগণকে সৰ্বদা উহা হইতে প্রতিবিরত রাখিতে প্রয়াস পান। ইহা যে তাঁহাদিগের কতদূর ভ্রম ও ইহাতে যে তাঁহারা শিশুদিগের কতদূর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা আদৌ বুঝিতে পারেন না। শিশুগণ বিবেকের অধীন হইয়া যে সকল কার্য করিতে যায়, তাহাতে কোন ক্রমেই হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য নহে। ইহার জায় অর্কাটীনের কার্য আর নাই। সহসা তাহাদের কথায় অবিশ্বাস করিতে নাই এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জন গর্জন ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা সৰ্বদা তাহাদের শাসন করিতে নাই। এরূপ করিলে তাহাদের উদ্যমশীল কোমল অন্তঃকরণে জড়তা জন্মে এবং ক্রমশঃ তাহারা ক্ষুর্ত্বহীন উদ্যমশূন্য নিম্প্রভ ও নিম্বেজ হইয়া পড়ে। স্মরণ্য উহা হইতেই ক্রমশঃ তাহারা দোষগোপনে অভ্যস্ত

হইয়া পড়ে এবং মিথ্যা কথা কহিতে আরম্ভ করে। বস্তুতঃ শিশুগণকে ক্রোধাদি হইয়া তর্জন গর্জন করাপেক্ষা বাহ্যে তাহাদিগের দোষ তাহাদের জন্মসম হয়, তদনুরূপ মিষ্টবাক্যে তাহা প্রদর্শন করিলেই অধিক ফল দর্শিগা থাকে। ক্রোধশীল উগ্রব্রতাব পিতা মাতার সন্তান কদাচ সহিষ্ণু হইতে সক্ষম হয় না।

যে গৃহ হৃদয় বর্ষভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যে পরিবারে প্রেম, শ্রীতি, দয়া, জ্ঞানপরতা, সত্যনিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা আছে, সে পরিবারের ভবিষ্যৎ উন্নতি অবশ্যস্বাবী। কি দাসদাসী কি প্রতিবেশিমণ্ডলী, এমন কি একদিনের নিমিত্ত সে গৃহে বিনি পদার্পণ করিয়াছেন ও সে পরিবারের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, সকলেই তাহার মধুর সৌরভে বিমোহিত, পবিত্র ও ধর্ম হইয়া যান। ধর্ম ও সদাচার আমাদের মনুষ্যত্বের পথে গাইরা যায় এবং অধর্ম ও অসদাচার আমাদের পশুর জায় জীবন বাপন করিতে শিক্ষা দেয়। ধর্ম-জীবনে আমরা এই রোগ-শোক-জ্ব-দারিদ্র্যময় বিশ্বসংসারের দস্ত কশাবাত অমানবদনে সহ্য করিতে সক্ষম হই, কিন্তু ধর্মহীন জীবনে আমরা অতি সামান্য একটা কুশাস্ত্রাবাত সহিতে অক্ষম হই। অধিকন্তু অধার্মিক সম্রাটের পদ অপেক্ষা ধার্মিকভিখারী জীবনই আমাদের অধিক বাঞ্ছনীয়। স্মরণ্য প্রত্যেক সম্মিবেচক ও ধর্মপরায়ণ জনক জননীই যে স্ব স্ব

সন্তানবর্গকে ধর্মশিক্ষা ও সদ্গুণ দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য করিয়া তোলা উচিত, এই চির পুরাতন কথাটি বোধ হয় আর কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

মঙ্গলময় ভগবান্ পিতামাতার স্বক্ষে সন্তানের ভার, পতির স্বক্ষে পত্নীর ভার, উপযুক্ত পুত্রের স্বক্ষে বৃদ্ধ জনকজননীর ভার, রাজ্যের স্বক্ষে রাজ্যভার, এবং গৃহস্থীর স্বক্ষে গৃহের দাসদাসী ও ব্যবসায় পরিজন পরিবারবর্গের ভার স্তম্ভ করিয়া আত্মাদিগের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। অতএব গৃহে যদ্যপি আমরা তাহা হইতে বিরত থাকি অথবা উহাতে অবহেলা করি, তাহা হইলে কি আমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্তব্যে অবহেলাজনিত মহাপাপে পাপী হইয়া ভগবানের নিকট কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইবার উপযুক্ত হইব না?

পুত্র অপেক্ষা কন্যার প্রতি মাতার অধিক দারিদ্র্য। কারণ কন্যাগণের শিক্ষা দীক্ষা যাহা কিছু, তৎসমুদায়ই মাতৃহস্তে। পুত্রগণকে অধিকাংশ সময়ই বাটীর বাহিরে অতিবাহিত করিতে হয়, কিন্তু কন্যাগণ সতত মাতৃগর্ভস্থানে অবস্থান এবং নিয়ত মাতৃচরিত্র পরিদর্শন করে বলিয়া অধিকাংশ স্থলে তাহারা মাতৃ-স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং একপ স্থলে আর কিছু না হউক অন্ততঃ প্রাণাধিক্ষা কন্যার কেবল ভবিষ্যতের মঙ্গলার্থেই মাতার সংপূর্ণাবলম্বন করা

এবং সতত তাহার প্রতি স্নেহী দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাহারা স্মৃতা হইতে ইচ্ছা করেন, ভরণ্য করি তাহারা এই সমুদায়ের প্রতি কখনও উদাসীন থাকিবেন না। আধুনিক মনোবাদের মাতাদিগের মধ্যে তিন সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। (১) যাহারা কেবল মাত্র কন্যাদিগকে স্কুল কলেজে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত হন। তদ্ব্যতীত যে তাহাদিগের অপর কোনও শিক্ষণীয় বিষয় থাকিতে পারে, তাহা তাহাদিগের আদৌ জ্ঞদয়গম্য হয় না। (২) যাহারা কন্যাদিগকে কি লেখা পড়া, কি গৃহ-কর্ম, কি বিনয়, দয়্য, ধৈর্য প্রভৃতি ব্রীজাতির উচিত কোন রীতি নীতি শিক্ষাই দেন না। বরং তৎপরিবর্তে ইহারা লজ্জাহীনতা, বিলাসিতা, কলহপ্রিয়তা, নাস্তিকতা, স্বার্থপরতা, দাস্তিকতা ইত্যাদি যতকিছু কুশিক্ষা হইতে পারে তাহাতে অভ্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে অকৃত প্রকারের জীব করিয়া তুলেন। (৩) যাহারা কন্যাগণকে কতকগুলি কুসংস্কার ও গৃহকর্ম শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, এই শিক্ষাজন্মের মধ্যে কোন প্রকারের শিক্ষা যে প্রকৃত মনুষ্যস্বভাবের উপযোগী নহে, তাহা বোধ হয় কাহাকেও আর নূতন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

পুত্রের ভার কন্যাগণকেও সংশিক্ষা দিয়া তাহাদিগের জ্ঞদয় ও মনের উৎকর্ষ সাধন করা প্রত্যেক পিতা মাতারই অবশ্য

কর্তব্য । কিন্তু উক্ত অঙ্গের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া বহুবায়সাপেক্ষ, দরিদ্র ভারতবাসীর গক্ষে তাহা প্রায় পোনের আনা লোকে এই অবস্থার অনুরূপ নহে, এবং এই শিক্ষা আমাদের গৃহ ও সমাজেরও তত উপযোগী নহে । অধিকন্তু, আমাদের অজ্ঞতা বশতই হটক অথবা যে কারণেই হটক, আমরা কত্যাগকে বি, এ, এমএ, পাশ করাইয়া তাহাদের লজ্জাশীলতা, হৃদয়ের কোমলতা প্রভৃতি জীজনোচিত মাধুর্যসমূহ নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে গুরুভাষিণী দেখিতে, ও তাহাদের মাতৃভবিকাশের পথ বন্ধ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদারী পুরস্কারের সমকক্ষ দেখিতে আদৌ ইচ্ছা করি না ।

আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রসুতিগণ আবহমান কাল ধরিয়াই সন্তানের লালন পালনের ভার স্ব স্ব কক্ষে বহন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান কালের অধিকাংশ জননী পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে আবাদিগের সেই কল্যাণজনক প্রথা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের জীর্ণ দরিদ্র হিন্দুসমাজকে আরও অধিকতর দরিদ্রতার পথে লইয়া যাইতেছেন । ইহাতে ক্রমশঃ আমাদের সমাজে যে নিত্য কত নব নব অভাব ও অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে, তাহা বর্ণনা-তীত । যে হলে জননীগণ স্বীয় কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া সামান্ত বেতনভোগী কাণ্ড-জানহীন দাস দাসীর হস্তে সন্তানপালন ও বেতনভোগী শিক্ষকের হস্তে সন্তানবর্গের

নীতিশিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া আপনারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে দ্বিধা বোধ করেন না, সেখানে সন্তানের উন্নতির আশা কোথায় ? যে মাতা আপনি কুরচিপূর্ণ নাটক নভেল পড়িয়া, তাশ খেলিয়া, পরনিন্দা, পরচর্চা, গল্প গুজব ও আমোদ প্রমোদ করিয়া সময় যাপন করিয়া থাকেন ও আশৈশব সন্তানবর্গকে সেই দূষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাতে অভ্যস্ত করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হয়েন না, তাহাদের সন্তানসম্ভতির জুহু সর্বল দেহ ও উন্নত চরিত্রের আশা কোথায় ? বস্তুতঃ যে পরিবারে সত্যো অনুরাগ ও পাপে ঘৃণা নাই, সে পরিবারের সন্তানবর্গের অনুষঙ্গ-লাভের আকাঙ্ক্ষা নিত্যই চরাশামাত্র । শিক্ষার মাত্র্য দেবত্ব ও শিক্ষার অভাবে মানব পশুর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আদিম কালের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য অমত্য বর্ষেরজাতীয় মনুষ্যগণই কি তাহার উদাহরণ নহে ? এখনও উক্ত প্রকার মনুষ্যের অভাব নাই, তবে বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জাতির অধিকারপ্রভাবে তাহাদের সংখ্যা অনেক নূন হইয়া আসিয়াছে এবং ক্রমশঃ আরও নূন হইয়া আসিবে, এরূপ আশা করা যায় ।

আমাদের সমাজে জ্ঞানশিক্ষাবিরোধী এক সম্প্রদায়ের লোক দৃষ্ট হয় । প্রাচীন কালে যে এদেশে নারীজাতির মধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচলিত ছিল তাহা তাহারা স্বীকার করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন, এবং বর্তমান কালের জ্ঞানশিক্ষার নামেও

তাহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তৎকালে নারীজাতির মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ছিল কি না, নিয়মিত প্রতিভাশালিনী বিদ্বী রমণীগণই তাহার দৃষ্টান্তহল। অতি প্রাচীনকালে অজিৎবংশীয়া বিশ্ববারা-নারী রমণী গণের একটি শৃঙ্খল রচয়িত্রী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মবাণিনী গার্গী, নৈকেয়ী, লোপামুদ্রা, শকুন্তলা, ক্রপদ-রাজকন্যা দ্রৌপদী প্রভৃতি এবং অপেক্ষাকৃত বর্তমানকালের লক্ষ্মণ সেনের পত্নী, জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শিনী খনা, অক্ষশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা গৌলাবতী, রাণী ভবানী, হাট বিদ্যালয়কার, প্রভৃতি নারীগণ দেশের চির-গৌরবের স্থল হইয়া রহিয়াছেন। এতগুলি মনোহীন বিদ্বী রমণীর জন্ম গ্রহণ করিয়া যে ভারতকে পবিত্র ও অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতে যে পূর্বকালে নারীদিগের মধ্যে বিভ্রাচ্ছা প্রচলন ছিল না, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? অধিকন্তু কি পুরুষ, কি রমণী, সকলের মধ্যেই তৎকালীন শিক্ষার বৈকল্য শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইত, বর্তমান কালের শিক্ষার তাহার শতাংশের একাংশও দৃষ্ট হয় না। সে উদার বিশ্বজনীন প্রেম, সে গভীর জীবন্ত ধর্মতাব, সে দেববাহিত পূর্ণীয় আত্মত্যাগ, সে অগাধ পিতৃমাতৃভক্তি, নারীসমাজের যে চরিত্রৈক্যাত্মিক পতিভক্তি, সে অকৃত্রিম সেবাপরায়ণতা, সে মধুর সন্তানবাসনা, সে অবিচলিত শুদ্ধ ভক্তি, সর্বসমূহ বহুধরার ভাষা সে অটল

সহিষ্ণুতা, সে সরলতা, ভক্তি, বিশ্বাস, মেহ, দয়া, দাক্ষিণ্য, জ্ঞান না, আজ কাল কোন্ অতল গর্ভে চির-নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে? হায়! আজ আমরা সেই ভারতনারী ভক্তিবিশ্বাসহীন, সতীর্ণহর, স্বার্থপরায়ণ, পুরুষের বিলাপের সামগ্রী ও ক্রীড়ার পুত্তলিকায় পরিণত হইয়াছি। অনেকে এজন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষ দেন। স্বীকার করি, এই শিক্ষা আমাদের নৈতিক জীবনের অবনতির অল্পতম কারণ হইতে পারে, কিন্তু কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর দোষারোপ করিলে চলিবে না। আমরা নিজেদের আত্মসম্মান প্রভৃতি সঙ্গুণ ভুলিয়া প্রত্যেক বিষয়েই বিদেশীদিগের অনুকরণই বা করিতে যাই কেন? আর যদি অনুকরণই করিতে হয়, কালপ্রভাবে যদি তাহাদের কিছু লইতেই হয়, তবে তাহাদের ভাল অংশটুকু না লইয়া মন্দ অংশটুকুই বা গ্রহণ করি কেন? এ দোষ আমাদের, না তাহাদের? ইহাতে আমাদের কি অকারণ গৃহের জঞ্জাল বুদ্ধি করা হইতেছে না? ইহাতে দেশ ও সমাজকে ক্রমশঃ অস্তঃসারশূন্য করিয়া ইচ্ছাপূর্বক জোর করিয়া কি অশংকতনের পথে টানিয়া আনা হইতেছে না? পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গুণরাশির অভাব নাই। তাহাদের বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, অমণ্টুতা, কাণ্য-কুশলতা, সাহস, কর্তব্যজ্ঞান এবং সকৌণরি তাহাদের স্বজাতিপ্রেম জগতে অতুলনীয়। হংসরাজের ক্ষীরগ্রহণের

ভায় তাহাদের চরিত্রের বন্দ অংশটুকু বর্জন করিয়া বদ্যাপি উকুষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে আমাদের জাতির সর্বাত্মক মঙ্গলের সম্ভাবনা, নতুবা এই অসুখরোগিণী বাঙ্গালি জাতির আর মঙ্গল কোথায়?

এক্ষণে নারীজাতির শিক্ষার কথা হইতেছে। যে শিক্ষায় আমাদের রমণীগণের মাতৃদ-বিকাশের পথ অটুট থাকে, আমাদের স্ত্রীজাতির পক্ষে সেই প্রকারের শিক্ষাই সর্বতোভাবে কল্যাণকরী বলিয়া অনুমান হয়। প্রকৃত পক্ষে নারীজাতি শাস্ত্রে স্বাংপর হওয়া অপেক্ষা বাহাতে তাঁহারা বিশ্বজনীন প্রেম, ভগবানে নির্ভর, এবং মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা উপলব্ধি করিয়া তৎকাৰ্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে সক্ষম হন, তদনুরূপ শিক্ষাই তাঁহাদিগের পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে মাতা কন্তাকে নৃদিগের সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম, শিল্পকর্ম, রন্ধন, সম্ভান পালন, ধরোপকার, মিতব্যয়িতা, লজ্জাশীলতা,

সেবা, ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্য এবং সর্বোপরি ধর্ম শিক্ষা দিয়া তাহার চরিত্র গঠন-পূর্বক তাহার সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, ভবিষ্যতে তাহার স্মৃতি ও স্মৃতিগী হইবার পথ সুগম করিয়া দেন, তিনিই সম্মানের প্রকৃত স্তোত্রধারিণী আদর্শ জননী, তিনি আমাদের নমস্ক এবং সর্বথা পূজ্য পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু বলিতে কি, আমাদের মধ্যে সেরূপ স্মৃতি নীতাই অভাব, এমন কি নাই বলিলেও বোধ হয় অতুলি হয় না। যে দিন আমাদের গৃহে গৃহে উল্লসিত মাতৃ-রূপিণী দেবী বিরাজ করিবেন, সে দিন আমাদের হৃৎকের সংসার জ্বলের হইবে, সত্য সত্যই জীর্ণের সংস্কার হইবে, এবং এই কঙ্কর ও কটকময় ভীতিসঙ্কুল জর্গম গৃহা-গণ্য স্বর্গের নন্দনকাননে পরিণত হইবে। কিন্তু হায় কে বলিতে পারে যে, আমাদের সে স্মৃতি ভবিষ্যতের কোন অন্ধকারময় গুহায় চিরনিদ্রিত রহিয়াছে?

বঙ্গবিধবা রচয়িত্রী।

ভূত না মানুষ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মৃত ব্যক্তির বক্তব্য।

রজনী যখন দ্বিশহর, তখন চণ্ডদেবের গৃহের দরজায় আঘাতের উপর আঘাত

হইতে লাগিল। সেই আঘাতের শব্দে চণ্ডদেবের নিজা ভাদিয়া গেল। তিনি ভয়ে

এত কাতর হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার চাকর চাকরাণীকে ডাকিবারও শক্তি রহিল না। বাহির হইতে স্পষ্ট স্বরে কে কহিল, “চণ্ডদেব দরজা খোল”। চণ্ডদেব সেই স্বরের মধ্যে এমন কি একটা শুনিলেন যে, তাঁহার ভয় বিগুণ বাড়িল। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া বায়ুতাড়িত কদলীপত্রের দ্বার কাঁপিতে লাগিলেন। বাহির হইতে সেই স্বর আবার কহিল “ঘরে কে আছিল, শীঘ্র দরজা খোল, নচেৎ দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিব”। চণ্ডদেব কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দ্বার উন্মোচন করিলেন। কে একজন যেন বড়ের মত বেগে ছুটিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চণ্ডদেব আপনাব শয্যাপার্শ্বে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠিলেন না, কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

আগন্তুক গর্জন করিয়া কহিলেন “আমার দিকে তাকা”। আগন্তুকের নৈত্র হইতে তখন অগ্নিস্থলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল তাঁহার জ্যোৎস্না যেন নৈত্রপথ দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতেছে। চণ্ডদেব মৃত ব্যক্তির দ্যায় অসাড়দৃষ্টিতে আগন্তুকের চক্ষুর দিকে তাকাইলেন। আগন্তুক একজন জীলোক। তিনি কহিলেন “আমাকে চিনিতে পারিস্”?

চণ্ডদেব কথা কহিলেন না।

জীলোকটী কহিলেন “কণ্ঠস্বর শুনিয়াও কি বুঝিতে পারিতেছিস্ না আমি কে”?

চণ্ডদেব ভগাপি কথা কহিলেন না।

জীলোকটী কহিলেন “চিনিতে পারিতেছিস্ না? পারিবি কেন? শুনি আমি কে, এক পক্ষে আমি তোঁর বন, অপর পক্ষে তোঁর পালিতা চন্দনীর মতা। চণ্ডদেব! এখন তুই রাজরাজেশ্বর বিগ্রহের প্রতি বাহ্যিক মনোনিবেশ করিয়াছিস্ বটে, কিন্তু যখন তুই রাজপুতানায় ছিলি, তখনকার কথা মনে করিয়া কেবল দেখি। তোঁরা গ্রহদেবের দুই পুত্র, মালদেব ও চণ্ডদেব। মালদেব অতি শৈশবেই মাতৃহীন হইয়াছিল। গ্রহদেব মালদেবের মাতৃস্বগাকে পুনরায় বিবাহ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনিও দুর্ভাগাক্রমে তোঁকে শৈশবেই মাতৃহীন করিয়া স্বর্গবাসে গমন করিয়াছিলেন। মালদেব কেন! যে শৈশবে হইতেই পিতা গ্রহদেবের অগ্রিমপাত্র হইয়াছিল, এ কথা আমি বলিতে পারি না।

গ্রহদেবের অনেক বিষয় ছিল। তিনি তাহার তত্ত্বাবধানের জন্ত ত্রোকেই প্রায় মকসলে পাঠাইতেন।

মালদেব পিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্বক নিকদেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। তুই পাণ্ডিঠ, চণ্ডদেব, মফসলে যাওয়ার জলে পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গভীর রজনী-যোগে উপস্থিত হইয়া গ্রামের লোকের উপর অত্যাচার করিতিস্। রাজপুতানায় মধ্যে আমার স্বামী একজন ধনী গৃহস্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন,

আমি তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলাম। তুই, চণ্ডদেব! তু-ই, তু-ই, তু-ই, আমার সর্বনাশ করিয়াছিস। মনে করিয়া দেখ, এক অন্ধকারাত্মক ঘোর রজনীযোগে তুই চুরি করিবার জন্ত, আমার রাজপুতানার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলি, কিন্তু আমার স্বামী তোকে ঘরিয়া খুব উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়াছিলেন। সেদিনের মত তুই পলাইয়াছিলি। এই ঘটনার দিন কয়েক পরে মনে হয় কি, চণ্ডদেব! ওঃ জীবন্ত নরক তুই, তোকে দেখিলেও পাণ হয়!! তুই চোরের মত দার কাটরা আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলি। আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বহুক্ষণ মঙ্গল হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, তোর সঙ্গে পারিবেন কেন? তুই তাঁহার মুখ ও হস্তপাদাদি দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া যে ভাবে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলি, তাহা দেখিলে পাষণ্ড ও বিদীর্ণ হয়। তাহা দেখিয়া আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই অবস্থায় আমার কথা কহিবার বা চোঁচাইবার শক্তি ছিল না। দেখিলাম তুই আমাদের যত ধন ছিল, তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইয়া পলাইলি। পর দিন প্রতিবেশিগণ আসিয়া আমার এই দশা দেখিল এবং স্বামীর সংস্কার করিল, কিন্তু আমি মৃতবৎ হইয়া রহিলাম, বলিবার বা চলিবার শক্তি আমার তখনও হয় নাই। তারপর জানি না তুই তোর পিতার নিকট হত্যাবিবরণ বিবৃত করিয়াছিলি কি না, কেন না, গ্রহদেব অতি বহু সহকারে আমাকে আপন গৃহে লইয়া আসিলেন।

পূর্বে হইতেই এই উত্তর পরিবারের মধ্যে বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। তিনি চিকিৎসক দ্বারা আমাকে চিকিৎসা করাইলে আমি আরোগ্য হইলাম। তিনি আমাকে অনেক ধন রত্ন প্রদান করিলেন এবং তাঁহার গুণ কর্তৃকই যে আমার স্বামিহত্যা হইয়াছিল, এ কথা আমাকে জনসমাজে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে তাঁহার গৃহেই রাখিলেন। এ অভাগিনীও ক্রমশ স্বামীর আত্মার নিকট অবিস্মিনী হইয়া গ্রহদেবের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু তিনি কখনও আমার অপমান করেন নাই। সে গৃহে তুই ব্যতীত অল্প কোন মাল্য কর্তৃকই আমি অপমানিতা হই নাই। আমি জানি না কেন সেই হইতেই মালদেব গ্রহদেবের অধিক অগ্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। খুন লইয়া কোন গোণযোগ্য হইবার পূর্বেই তিনি মালদেবকে তির-বর্জনপূর্বক, তোকে ও আমার পুত্র মন্দক ও কস্তা চন্দনীকে সঙ্গে লইয়া, রাজপুতানা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিলেন। তোর সঙ্গে একত্র হইয়া এখানে আসিতে আপত্তি করিয়াছিলাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তখনও তিনি তোর দোষ ফালনপূর্বক কহিলেন 'তোমার ভয় নাই, একাজ চণ্ডদেবের নহে'।

আমি কহিলাম 'আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি', তিনি কহিলেন 'তুমি ভুল দেখিয়াছিলে।'

আমি কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। সে বাহ্যেউক

এখানে আসিয়া তুই কয়েক দিন বেশ শান্ত ও ভদ্র বাবহার করিয়াছিলি।

কিন্তু গ্রহদেবের মৃত্যুর পর আবার জ্বালাতন করিতেছিলি। আমার দ্বারীকে তুই হত্যা করিয়াছিলি, আমার যত ধন সম্পত্তি তুই হরণ করিয়াছিলি। তোর পিতা তোর হত্যা ও চুরীর অপরাধ গোপন রাখিবার জন্ত আমাকে অনেক ধনের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত ধনও অপহরণের নিমিত্ত তুই বহু চেষ্টা করিয়াছিলি। তুই খুনি আসানী এবং তোর সেই খুন করার বিবরণ প্রকাশ করিবার মাহুষ আমি একজনমাত্র আছি, তাহা তুই বেশ বুঝিয়াছিলি। মনে করিয়া দেখ, এইখানে এই গৃহে তুই আমাকে হত্যা করিয়াছিলি। এক দিন রজনী দ্বিপ্রহরে যখন জগতের সমুদায় প্রাণীই ঘুমাইতেছিল, তখন চণ্ডদেব! তুই একটা মাদকহস্তে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলি। আমাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া সেই মাদক পান করাইয়াছিলি। তুই পুরুষ, আমি স্ত্রীলোক, তোর সঙ্গে আমি পারিবে কেন? কোন কোণে তুই আমার কণ্ঠনালী রোধ করিয়াছিলি। আমি চীৎকার করিতে অথবা কথা কহিতে পারিতেছিলাম না, বাধ্য হইয়াই আমাকে তোর দত্ত মাদক পান করিতে হইয়াছিল। ঐ মাদক পানের পর আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার ৯ বৎসরের কন্যা চন্দনী আমার পাশেই ছিল, তাহাকে তুই বাগিকা বলিয়া ভুচ্ছ করিয়াছিলি, তুই

ভাবিয়াছিলি সে নীচ্রই সমস্ত কথা ভুগিয়া যাইবে, কিন্তু সে সমুদায় কথাই মনে রাখিয়া রাখিয়াছিল। আমার বেশ বোধ হয়, বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই প্রতিক্ষণনিয়ম সঙ্গে চন্দনীর আলাপ প্রলাপে তুই তাহার আভাস পাইয়াছিলি, এবং তজ্জন্যই বিমোহিত হইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিলি। কিন্তু সে কথা তোকে পরে স্বরণ করাইয়া দিব। অগ্রে গত কথা আমি বিস্তৃত হইয়াছি কি না, তাহারই প্রশ্ন দেখ। চণ্ডদেব, আমি তোকে ভূতের ভয় হইতে মুক্তি দান করিয়া কহিতেছি যে, আমি আত্মা অথবা ভূত নহি। জানিস্ চণ্ডদেব, যিনি অন্তর্ধামী তিনি হৃদয় বিচারক এবং তাহার প্রভাবেই আমি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছি। কিরূপে জীবিত হইয়াছিলাম তাহা শ্রবণ কর, যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন রজনী প্রভাত হয় নাই। আমি চৈতন্য পাইয়া উঠিরা বলিলাম। দেখিলাম আমি একটি নির্জন প্রান্তরের ভিতর পড়িয়া রহিয়াছি, সেখানে জনমানবের চিহ্ন মাত্র ছিল না। একটি উৎকট গন্ধ আসিয়া আমাকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, গন্ধট আমার শরীর হইতেই বাহির হইতেছে। তৎপরেই দেখিতে পাইলাম বমনে আমার সকল শরীর সিক্ত হইয়া গিয়াছে ও সেই বমন হইতেই ঐ উৎকট গন্ধ বহির্গত হইতেছে। সেই গন্ধ যতই আমার নাসিকায় আসিতে লাগিল, আমি ততই বমন করিতে আরম্ভ করিলাম। তুই

আমাকে যে মাদক খাওয়াছিল, তখনও বমনের সঙ্গে তাহাই নির্গত হইতে ছিল। এতক্ষণে আমি বুদ্ধিতে পারিলাম যে, এই বমনই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে। সেই বমনরূপ মহোদধ আমার উদর হইতে প্রাণঘাতক মাদক বাহির করিয়া ফেলিয়াছে এবং রক্তনীর শৈত্য দ্বারা মস্তিষ্ক নীতল হওয়ার আমি এত শীঘ্র চৈতন্য লাভ করিতে পারিয়াছি। বিবাক্ত মাদক আমার শরীরের উপরে কোন কাজ করার অগ্রহেই বমন হইয়া সমস্ত উষ্ণতা গিয়াছিল, সেই জন্যই আমি পুনর্জীবন লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। দেখ চণ্ডদেব! প্রাণ ভরিয়া দেখ, বিধাতার কি প্রচণ্ড প্রতাপ! তিনি কেমন কৌশলে মরা মানুষকে বাঁচাইলেন। কেন তাহা জানিস? পাপীর পাপের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবার জন্য। দেখ, দেখিয়া তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হ'। চণ্ডদেব কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার কথা কহিবার শক্তি রহিত হইয়াছিল। ভয় ও বিস্ময় তাঁহাকে বাকপঞ্জিহীন করিয়া রাখিয়াছিল। অগম্যক আরও কহিলেন "তার পর কি হইল শোন, আমি তথা হইতে উঠিয়া গিয়া নদীর জলে অবগাহন করিলাম। আমার শরীর নীতল হইল। তখন কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। দৈবাৎ এক জন বেগিনী ব্রীহলাকের সহিত আমার দেখা হইল, তাহার আগ্রহান্তি-শয্যে তাহার নিকট আমার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিলাম। প্রতিহিংসার ইচ্ছায়

আমার শরীর জলিতেছিল। বেদিনী কহিল 'আমার সঙ্গে এস, তোমাকে নানা রকম বিজ্ঞা শিখাইক। সেই সব বিজ্ঞাযগে তুমি শত্রু দমন করিতে পারিবে'। তখন আমার সম্মান নন্দক বালক ছিল এবং সে তোরই নিত্য বান্দা ছিল। বেদিনীর পরামর্শ ব্যতীত শত্রুদমনের জন্য কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না। বেদিনীর সঙ্গেই চলিলাম। নন্দক ও চন্দনীর জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। কিন্তু আমি বেশ জানিতাম, তুই নন্দক ও চন্দনীকে অতি যত্নেই প্রতিপালন করিবি। কারণ তুই তাহাদিগকে হুসহোদর ও সহোদরার ছায় ঘেহ করিতাম। ঘেহ করার আর এক কারণ ছিল যে, তুই ভাবিতাম তাহার শিশু, তাহাদিগের দ্বারা তোর গুপ্তকথা ব্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমার কোমরে গোপার একটা রেডু ছিল, তাহার সাহায্যে রাজপুতানার গেলাম এবং প্রাথমিক ছদ্মবেশে থাকিয়া আমার মৃত্যুসংবাদ সর্বত্র প্রচার করিলাম। তৎপরে নানা উপায়ে আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই বেদিনীর সঙ্গে বাহির হইলাম। পরে দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আমি নানা উপায়ে নানা প্রকার বিজ্ঞা শিক্ষা করিলাম। কাল মাল্লকে ধলা, ধলা মাল্লকে কালা করিতে শিখিলাম। বাকপটুকে বোকা এবং বোকাকে কথা কহাইতে আমার অধিক সময় লাগিত না। অনেক দিন পরে আবার পুরমণ্ডলে আসিলাম।

নন্দকে বেশ সুস্থ এবং সুখী বলিয়াই
বোধ হইল। চন্দনীকেও সুস্থ দেখিলাম,
কিন্তু সুখী বলিয়া বোধ হইল না।
বুঝিলাম তুই তাহাকে সুখে রাখিস্ নাই।
কি করিব, তোকে জব্দ করিবার জন্ত
নন্দকের সাহায্য পাইতে ইচ্ছা হইল।
কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, নন্দক,
প্রত্যেক চণ্ডদেব। তোর মায়ায় একেবারে
বিত্তর হইয়া রহিয়াছে, সে কখনই তোর
কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণে সহায়তা করিবে না,
আর তোর বিরুদ্ধে তখন ভাণ্ডারপক্ষীরও
যোগাড় ছিল না। নানা কারণে প্রকৃত্ত
আদালতে তোর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে
বিরত হইয়াছিলাম। তখন বরাহপুর
যাওয়ার পথে ভীষণ বনের ধারে একটা
কুটার নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগি-
লাম। এদেশে আসার পরই ভূতের বনের
বিবরণ সমুদায় জনিতে পাইয়াছিলাম।
এই সব বিষয়ে তোর উপরেই আমার
কতক সন্দেহ হইয়াছিল। সে যাহা হউক,
ভূত প্রপীড়িত মানুষ অথবা ক্রান্ত পথিক-
বর্গের কোন উপকার করিবার ইচ্ছার আমি
এইরূপ করিলাম। তোর উপর প্রতিহিংসা
ভুলিতে না পারিয়া ঘোর অশান্তিতে
কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। পাপিষ্ঠ!
তোরা প্রতিমূর্তি গঠনপূর্বক তাহা ভূমধ্য-
স্থিত একটা গুপ্ত ঘরে লুকাইয়া রাখিলাম।
প্রতিদিন সেই মূর্তির মুখে পাচবার করিয়া
কাঁটা মারিতাম এবং সম্রাজ্ঞীটী তাহার
মুখের উপরেই রাখিয়া দিতাম। মধ্যে
মধ্যে কুটারের দ্বার বন্ধ রাখিয়া আমাকে

পূর্বদণ্ডে থাকিতে হইত। অনেক
চেষ্টার পর বুঝিতে পারিলাম, ভূতের
বনের সমুদায় কাণ্ডই তোরা বুঝিলাম,
কি কি কৌশলে তুই ভূতের বল
প্রাপ্ত হইয়াছিস্। আমিও যে উপায়ে ও
যে কৌশলে নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষা
করিয়াছি, তুইও সেই উপায়েই এ সব
অদ্ভুত বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছিস্। তোর
শক্তি দেবীরা আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম।
আমি নীজে নাবিকবেশে চণ্ডদেব!
তোকে তিন দিনের রাত্ৰায় রাখিয়া
আসিলাম। করিয়া আসিয়া দেখি, তুই
দেশের মধ্যেই রহিয়াছিস্ ও রজনীযোগে
লোকের অনিষ্ট করিতেছিস্। তোর
অসাধ্য কোন কৰ্ম পৃথিবীতে নাই তাহা
আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম। তোর মধ্যে
হই ভাব আছে, এক ভাব দানবত্ব, অপর
দেবত্ব। দেবত্ব দ্বারা তুই সকলের নিকট
জয় ও মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইতাম্, আর দানবত্ব
দ্বারা তুই সকলকে পরাজয় করিতাম্।

অনেক অমূল্যক্রানের পর তোর
বাসস্থানের সন্ধান পাইলাম। তারগরে
শোন্ একদিন রাত্ৰিতে ভ্রমণ করিতে
করিতে দেখিতে পাইলাম কতকগুলি
লোক নিঃশব্দে নীরবে একটি উচ্চ পাহাড়ের
উপর আরোহণ করিতেছে। আমিও
অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে
পাহাড়ের উপর উঠিলাম। দেখিলাম,
পাহাড়ের পশ্চাৎ দেশ এত গভীর যে
তথা হইতে নিম্ন দিকে দেখিলে সে
স্থানটিকে পুরাণোক্ত পাতালভূমি বলিয়াই

বিবেচিত হয়। কিন্তু সেই গভীর গর্ভের মধ্যে উচ্চ অলুচ বালুকাস্তূপের অভাব ছিল না। আরও দেখিলাম সেই উচ্চ পাহাড়ের কোটাদেশ স্পর্শ করিয়া একটি অতি উচ্চ বালুকাস্তূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেখিলাম ঐ লোকগুলি সকলে একত্র হইয়া উচ্চ পাহাড় হইতে সেই বালুকাস্তূপের উপর লাফাইয়া পড়িল। একটু পরে আমিও সেখানে লাফাইয়া পড়িলাম। প্রথমে আমার দক্ষিণ অঙ্গ বালির মধ্যে প্রোথিত হইয়া গেল এবং আমি অতি কষ্টে আপনাকে আপনি উদ্ধার করিলাম। বুঝিলাম সকলেরই এইরূপ অবস্থা হয়। ভাবিলাম ইহার পর বারে অতি সতর্ক হইয়া অর্থাৎ বাহাতে পদ ব্যতীত অঙ্গ অঙ্গ প্রোথিত হইতে না পারে লাফাইয়া সেইরূপে পড়িতে হইবে। সে যাহা হউক, দেখিলাম পাহাড়ের একদিক অত্যন্ত ঢালু এবং সেই সব লোক একত্র হইয়া সেই ঢালু স্থানের উপর বসিল ও সর, সর করিয়া অঙ্গ কাণের মধ্যেই পাহাড়ের নিম্নদেশে চলিয়া গেল। ঐ উপায়ে আমিও নীচে নামিয়া পড়িলাম। আশ্চর্য্যের জন্ত কিছু ধূনা ও কিছু সরিষা মন্ত্রপুত করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলাম। বলিতে কি আমার সঙ্গেই উহা প্রায় থাকিত। ঐ ধূনা বাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ফেলিতাম, ফণেকের অঙ্গ তাহারাই মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইত। আর ঐ সরিষা নিক্ষেপ করিলে মানুষকে ফণেকের জন্ত নির্দাক হইয়া থাকিত

হইত। তাহাদের নদে নীচে আসিয়া তথায় লতাপত্রনির্মিত একটা সুন্দর গৃহ দেখিলাম। বরের মধ্যে কতকগুলি লোক বাস করিতেছিল। আমি একটা উচ্চ বৃক্ষে উঠিয়া পাতার মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম। আমাকে কেহ দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি সকলকে দেখিতে লাগিলাম। তাহাদের সকলের মুখে তোর নাম অনেক বার শুনিতে পাইলাম। ইহারি মাগদেবের নাম এবং গ্রহদেবের নামও সময় সময় উচ্চারণ করিল এবং ইহারি যে তোরই লোক তাহা বুঝিতে আমার বাকি রহিল না। অবশেষে কেহ কেহ গুপ্ত দরজা খুলিয়া চলিয়া গেল, তাহাও আমি দেখিলাম। সেই ভাবে সেইখানে অনাহারে অনিদ্রায় তিন দিন তিন রাত্রি আমাকে কাটাইতে হইয়াছিল। চতুর্থ দিনে দেখিলাম অনেক গুলি লোক চলিয়া গেল, অল্প লোকই ঘুমাইয়া রহিল। আমি তখন ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে নামিয়া নিম্নিত লোকগুলির উপর ধূনা নিক্ষেপপূর্বক গুপ্ত দরজা খুলিয়া চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম, একটা স্বড়ঙ্গ কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে। স্বড়ঙ্গের উপর নব্বদ্বন্দ্বীদলাবৃত একখণ্ড বৃহৎ মাটা। না দেখিলে সে গুপ্ত দরজা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা মানুষের গণ্ডে একরূপ অসম্ভব। স্বড়ঙ্গ হইতে বাহির হওয়ার পথটার উপরে অশ্বথ বৃক্ষের একটা প্রকাণ্ড শাখা আসিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অতি সতর্কভাবে এবং কৌশলের সহিত সেই শাখা ধরিয়া বৃক্ষের উপর উঠিতে

হয়। বৃক্ষ হইতে ভূমিতে নামিবার কোন উপায় ছিল না। ঘোর কণ্টাকাকীর্ণ বন এবং ঘন ঘন গছবর ও উচ্চ ভূমি সে বনটিকে এমনি দুর্গম করিয়াছিল যে, জীবনের আশা তাগ না করিলে মানুষ সেখানে বাইতে পারিত না। ঘনসরিবিষ্ট উচ্চ বৃক্ষে চারি দিক্ পরিপূর্ণ। এক বৃক্ষ হইতে আর এক বৃক্ষে লাফাইয়া পড়িতে হয়। অতি কোণে ও সতর্কভাবে পাখা পরণ ধরিয়া এক বৃক্ষ হইতে অল্প বৃক্ষে বাওয়া যায়। এইভাবে প্রায় কুড়ি মাইল গথ বাইতে হয়। তাহার পর একটি নির্জন পার্কতা ভূমি। একটি বৃক্ষ একটা উচ্চ পাহাড়ের সঙ্গে সংলগ্ন, প্রথমে সেই বৃক্ষ হইতে উচ্চ পাহাড়ের উপর নামিতে হয়, তৎপরে সেই পাহাড় হইতে ভূমিতে অবতরণপূর্বক একটি নির্জন মাঠ পার হইয়া জনসমাজে আসিতে হয়। আমিও ঐরূপে জনসমাজে আসিলাম। এইরূপে কয়েক বার গছবরে গেলাম। গছবরের মধ্যস্থিত বৃক্ষের উপর অগচ্ছ্য বাসকালে সেই স্থান হইতে অনেক বার চন্দনী, নন্দক, চণ্ডদেব ও আমার নাম শুনিতে পাইয়াছিলাম। প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীর নাম ও ছইটী বালিকার কথাও তাহারা কহিত। এই ঘটনার পর আমি মধ্যে মধ্যে বন ও নির্জন স্থান তাগ করিয়া ছদ্মবেশে জনসমাজে বাহির হইতাম। চণ্ডদেব! তুই বহুজপী, তুই সকল সময় দানবের বেশে থাকিস্ না, অনেক সময় দেবতার বেশে ধরিস্। কোন কোন সময়

(তাছাড়া সকলের উপর নহে, কেবল আমাদের উপর অথবা কোন সুন্দরী জীণোকের উপর) অভ্যাচার করিস। তোর এত টাকা থাকিতেও তুই টাকার কাজাল হইয়া ফিরিস্। টাকার জন্ত তুই সব অজ্ঞান কাজ করিতে পারিস্। একদিন তুই বহুদূরে গিয়াছিস্ জানিয়া নিশ্চিত মনে বেড়াইতেছিলাম, হঠাৎ তোকে সম্মুখে দেখিলাম এবং ছদ্মবেশী বলিয়া তোর একটু গন্দেহের দৃষ্টিতেও পড়িয়া গেলাম। তদবধি আর এ দিকে আসিতাম না, সেই ভূতের বনের সন্নিহিত বনের ধারের কুটারে বাস করিতে লাগিলাম। একদিন আমি মনের যত্না নিবারণ করিবার জন্ত অনেক মদ পান করিয়াছিলাম, সেই দিন নন্দক চন্দনীর মূর্ত দেহ লইয়া আমার কাছে গিয়াছিল, কিন্তু আমি মদের ঝোঁকে তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই। তৎপরে চন্দনীকে চিনিয়া হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ি। নন্দক চনিয়া গেলে ভাল করিয়া চন্দনীকে দেখিয়া তখনও দেহে প্রাণ আছে জানিতে পারি। তীব্র বিষ তাহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি বিপরীত চিকিৎসায় তাহাকে আরোগ্য করিলাম। চন্দনী আরোগ্য লাভ করিয়া তাহার জীবনের সমুদায় ঘটনা আমার কাছে কহিল। সে তোর পাশবিক আচরণে কুমারীধর্মে বঞ্চিতা হইয়াছিল। প্রতিধ্বনির অপহরণের কথাও সমুদয় শুনিলাম। তখন আমি সব বুঝিলাম। তোর উপর

ভীষণ ক্রোধ নিবারণের জন্য চন্দ্রনীকে
লইয়া পলাইলাম । তোকে পৃথিবী হইতে
বিদায় করার জন্য কোন উপায় না পাইয়া
চন্দ্রনীকে ভূত বাজাইলাম এবং নানারূপ
হাব ভাব-চলন চরিত্র শিখাইয়া তোকে
মারিতে পাঠাইলাম । ভূতে মারিলে

আদালতে প্রকাশ হইবে না, এইজন্য
এইরূপ করিলাম । চন্দ্রনি তাহার বস্ত্র-
হস্তকে বধ করিবার জন্য মহা উৎসাহে
যাত্রা করিল । সে অল্প পরিমাণে কৃতকার্যও
হইয়াছিল । কিন্তু নন্দকের সাহায্যে তখন
তুই রক্ষা পাইয়াছিলি । (ক্রমশঃ)

শাক্য সিংহ বা বুদ্ধদেব ।

(১)

বিরলে বসিয়া চিন্তায় মগন,
রাজার ভনয় তেজেতে তপন,
মেঘাবৃত কেন দেখিতে পাই ?
একি হেরি শিশু ভাবে মাতোয়ারা,
আপনার ভাষে আপনিই হারা,
জনকজন্ময়ে অল্পথ তাই !

(২)

ভাবেনজনক কি হইবে হায়,
সত্য তনয়ে হেরি ভাবনার,
কি ক'রে ইহার ফিরাই মন ?
সংসার-কামনা ইহার অন্তরে
কি ক'রে উপজে কে বলে আমারে ?
এক মাত্র পুত্র সর্বস্ব ধন ।

(৩)

এই কথা শুনে একজন কহে,
“রাজন, কহেন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
পুত্র আপনার হবে না ঘরে,
পরিণয়পাশে বাঁধই ইহারে,
তবে ত ছদ্ম বসিবে সংসারে,
নতুবা রাখিবে কেমন করে ?”

(৪)

ডাক দিয়া কহে রাজা শুকোদন,
“ওহে পাত্র মিত্র ! যে আছে এখন,
গতের কুমারী করহ দ্বির ;
পুত্রের বিবাহ দিব শুভক্ষণে
ইহার অত্যা করিব না মনে,
ছদ্ম আমার যত অধীর ।”

(৫)

বিবাহ হইবে, পুত্রবাসিগণ,
মঙ্গল আচারে রত অলক্ষণ,
বিবিধ বাজনা বাজিছে তাই,
নর্তকী নাচিছে গায়ক গাইছে,
মধুর সঙ্গীত বিমানে ছুটিছে,
আনন্দের আর অবধি নাই ।

(৬)

বিবাহ হইল, কিছু দিন পরে,
পুত্র মুগ্ধশশী অবনী উপরে
রাজার ভবন করিল আলো,
সংসার-সন্তোষ, বিলাস-বাসনা,
শিশুর স্বপ্ন, পবিত্র ললনা,
কিছুই কুমারে লাগে না ভাল ।

(৭)

একদা গভীর নিশীথসময়,
স্বপ্ন ধরলী জনক যুগ্ম,
সহসা স্বপনে উঠিয়া বেগে,
'কোথা পুত্র মম কুমার আমার'
বলিয়া জনক করি হাহাকার,
অন্তঃপুরভাগে আসিল বেগে ।

(৮)

আসিয়া কধুকী কহিল তখন,
নাহিক ভাবনা নিদ্রায় মগন,
আছেন কুমার পালক পরে,
শুন নরপতি পূর আপনার
মনের বাসনা করেন প্রচার,
প্রমোদ-উত্তানে ভ্রমণ তরে ।

(৯)

প্রভাত যামিনী, হাসে দিবাকর,
পাত্র মিজ সবে আনন্দ অন্তর,
কহেন নরেশ সভার মাঝে,
"তনয় আমার করেন মনন,
কুহুম উদ্যানে করিতে ভ্রমণ,
সাজাও নগর বিবিধ সাজে ।

(১০)

বাজিল বাজনা নর্তকী নাচিল,
সঙ্গীতলহরী গগন পূরিল,
ছন্দধ্বজা শোভে পথের পরে,
পুরবাসিগণ, আনন্দে মগন,
আসিল কুমারে করিতে দর্শন,
হেরিল কুমারে নয়নভরে ।

(১১)

পূর্ব দ্বারে হেরে নৃপের নন্দন,
করা তার-প্রাপ্ত বৃদ্ধ একজন

ঘাইছে বসিতে নির্ভর করে,
নাহি দস্ত তার বদন বাহার,
শুক রক্ত মাংস, অস্থিমাংস সার,
অনাহারে নাহি বচন সরো ।

(১২)

জ্যোতিহীন আঁখি শুভ্রবর্ণ কেশ,
দেহে নাহি বল জীবনের শেষ,
যৌবন তাহার গিয়াছে চলে,
নিস্তেজ ইন্দ্রিয় বুদ্ধির বিনাশ,
দেহের-সৌন্দর্য না পায় প্রকাশ,
ঢেকেছে সর্পিঙ্গ ধুলির দলে ।

(১৩)

ডাকিয়া কহেন কুমার তখন,
একি হে সারথি করি বিলোকন,
বুঝায়ে আমায় দাও হে বলে ।
কহিল সারথি, "জরাগ্রস্ত নর,
এ দশা ইহার অবনী উপর,
দেহের শক্তি গিয়াছে চলে ।"

(১৪)

ফিরাও সারথি রথ ঘর পানে,
আজকে বাব না প্রমোদকাননে,
কহেন কুমার কুণ্ঠিত অতি,
এই ত লোকের গরিত যৌবন,
কালের দশনে হয়েছে পেণণ,
দিক্ মানবের সংসারে মতি ।

(১৫)

দক্ষিণ তোরণে আজকে আবার,
উদ্যানভ্রমণে আসেন কুমার,
হেরেন পীড়িত মানবে হায় ।
বহুরোগগ্রস্ত শীর্ণ-কলেবর,

বিকট-আকার যাতনা কাতর,
আপন পুরিষে গুইয়া রয়।

(১৬)

দীর্ঘশ্বাস তার বহে ঘনে ঘন,
ফেলিয়া গিয়াছে বান্ধব স্বজন,
বিকল ইন্দ্রিয় চেতনা নাই।

হেরি তাহে কহে নৃপের নন্দন,
ফিরাও সারথি রথ এইক্ষণ
যাব না উদ্যানে ঘরেতে বাই।

(১৭)

আজিকে ভেদিয়া পশ্চিম তোরণ,
করেন কুমার কাননে গমন,
পথের উপরে হেরিতে পান,
বস্ত্রাবৃত দেহ খাটের উপরে,
নাহিক জীবন তাহার ভিতরে,
ভাঙ্গিয়া পিঞ্জর গিয়াছে প্রাণ।

(১৮)

আত্মীয় স্বজন করে হাহাকার,
বক্ষে করাঘাত করে অনিবার,
ঘোর আর্জনাতে গগন পূরে,
অনিভা মানব, অনিত্য শরীর,
সকলি অনিত্য সংসারে দেহীর
হায়রে কেবল প্রকাশ করে।

(১৯)

সারথিরে ডাকি কছেন কুমার,
ঘর পানে রথ ফিরাও আমার,
উদ্যানবিহারে বাসনা নাই,
জীবের দুর্দশা হেরিয়া আমার,
হৃদয়ে উথলে শোকপান্নাবার,
কিলে নিবারণ বলহে তাই।

(২০)

উত্তর ভোরণে আজায় রাজার,

চালাইল রথ সারথি এবার,
হেরেন কুমার ভিক্টর নরে,
শাস্ত দাস্ত অতি প্রশান্তমনে,
ভিক্ষাভাণ্ড হাতে মুষ্টি মাজ লয়,
তাহাতে জীবন ধারণ করে।

(২১)

পূণ্যালোকে দেহ উজ্জল তাঁহার
কষায় কাপড় পরিধান মার,
উদ্বেগে নয়ন নাহিক তুলে,
জিতেন্দ্রিয় নর বিনয়ভূষণ,
সর্বজীবে সম করেন দর্শন,
চিত্ত স্থির সদা ধরম মূলে।

(২২)

কহরে সারথি ইনি কোন্ জন,
সত্য স্তম্ভী এঁরে করি বিলোকন,
বিমল আনন্দে প্রফুল্ল অভি,
কহিল সারথি ভিক্টর এ জন,
প্রব্রজ্যা-সুখেতে সদাই মগন,
হিংসা রাগ ঘেবে নাহিক মতি।

(২৩)

শুনহে সারথি জীবন ইহার
কে যেন আঁকিল হৃদয়ে আমার,
ইহাই আমার লাগিল ভাল,
আত্মপরহিত হইবে ইহাতে,
ইহার সমান কি আছে মহীতে,
ঘৃতিবে অজ্ঞান তিমিরজাল।

(২৪)

জরা ব্যাধি মুক্তা হেরিয়ে তাঁহার,
ঘটিল বিষম মনেতে বিকার,
সংসারলালসা ঘৃণিল তাই;
অজ্ঞান বাহারা, বিষয়-কাননে,

যুরে বিবসয় ফল আশাদনে,
চরমে যাছাতে নিস্তার নাই।।

(২৫)

হারের মানব অবোধ মন,
অজ্ঞানতিমিরে ঘুর অকারণ,
জান যদি চাও এগরে চলে,
যৌবন-গৌরব বিলুপ্ত জরায়,
বাপিতে শরীর সতত পুড়ায়,
সকলি ফুরায় মরণ হলে।

(২৬)

কেন তবে বল সংসারে আবার,
এই পুত্র মম এই পরিবার,
এই গৃহ সার বৈভব ভবে ;
তাজ অহকার শিখরে বিনয়।
মাটির মাগুবে উচিত যা হয়,
ধূম ধান ভবে কদিন রবে ?

(২৭)

জ্ঞানার্থী কুমার লানা স্থানে গিয়া,
জ্ঞান লাভ করি তপস্তা শিখিয়া,
বারাগলী ধামে আসিল চলে,
জ্ঞানের প্রচার করিতে লাগিল,
ধর্মের পিণাসা মিটাইয়া দিল,
দয়াতে তরিল মানবকূলে।

(২৮)

একি কোলাহল করিবে শ্রবণ,
প্রতিধ্বনি দোয় করিল নিকণ,
পূরিল সমস্ত ভারত দেশ ;
আনন্দলব্ধী ছুটিতে লাগিল,
নর নারী সবে স্তব্ধেতে ভাসিল,
হৃথের বামিনী হইল শেষ।

(২৯)

কে এল কে এল দেবরে চাহিয়া,
প্রভাত অরুণ লাবণ্য মাখিয়া,
ধর্মের আকাশে উদয় হ'ল ;
কিরণ তাহার চৌদিকে ছুটিল,
জীবের হৃদয় আলোকে পূরিল,
অজ্ঞানতিমির দূরেতে গেল।

(৩০)

শিখান গৌতম মনের আবেগে,
“আলস্ত তাজিয়া উঠ সবে আগে,
“জীবের উন্নতি কররে ধ্যান,
“অগার জীবন বল কতক্ষণ
“হিংসা হেব সদা কররে বর্জন,
“পরমার্থ তরে লভবে জ্ঞান।

(৩১)

“প্রেমরাজ্য ভবে কররে বিস্তার,
কাহারও আগে দিও না ব্যথা,
“হৃদয়ে স্বজরে মেহের সাগর,
“ডুবাও তাছাতে বিখ-চরাচর,
“বুঝিতে পারিবে বৃদ্ধ ধর্মকথা।

(৩২)

“রণপ্রিয় যত ক্ষত্রিয়জনর,
“তাজ রণবেশ তাজ সমুদায়,
“কোটির কুপাণ দেহেরে ফেলে,
“জ্ঞানের কুপাণ কররে ধারণ,
“মায়া মোহ রিপু কররে ছেদন,
“ধর্মের পথেতে এগরে চলে।

(৩৩)

“এস ভববাসী যে আছ যথায়,
“অমৃতের নদী বহিছে হেথায়,
“মনের স্তব্ধেতে কর রে পান,

“বৌদ্ধধর্ম সার করহ আশ্রয়,
“হুঁরে যাবে তব ঘোর ভবজয়
“সংসারবন্ধনে পাইবে জাগ।”

(৩৪)

পঞ্চাশত কোটি মানবে মিলিয়া
ধন্য বুদ্ধ তুমি বলিল উঠিয়া,
যত্ন হে জনম তোমার ভবে,
ধন্য মায়াবতী তোমার ধননী,
যাহার পুণোতে তরিল জবনী,
জয় জয় বুদ্ধ বলিল সবে।

(৩৫)

পুনর্জন্ম আর নাহি জীবকূলে,
শিখান গৌতম জয়ডঙ্কা তুলে,
নির্দোষ প্রচার করেন সবে ;
লঙ্কা চীন দেশ তিব্বত আগার,
যে যথায় আছে এস রে এবার,
ভাই ভাই সবে মিলিব ভবে।

(৩৬)

অদৃঢ় বন্ধনে মিলিব সবাই,
জাতিভেদে আর কোন কাজ নাই,
ববন হিন্দুতে এসরে চলে ;
সামোর নিশান তুলিয়া হেথায়,
দাঁড়াইয়া আছি লইতে সবার,
আসিয়া দাঁড়াও তাহার তলে।

(৩৭)

পরস্পারে হৃদি দেহেরে খুলিয়া,
অস্থিসার ধর্ম যাওরে শিখিয়া,
বৌদ্ধ ধর্ম ভবে বিস্তার কর,
জাতিভেদ সব যাওরে তুলিয়া,
শাস্তিসুখা সবে দাওরে বাঁটিয়া,
জীবের মঙ্গল হৃদয়ে ধর।

(৩৮)

জয় জয় দেব হুঁ মহামতি,
গাও ভক্তবৃন্দ উল্লাসেতে মাতি,
জয় তব নাম উদ্ধার তরে,
তব পারাবার, তুমি কর্ণধার,
তব ধর্মতরী রক্ষা সবারকার,
তোমার মিলনে তরিল নরে।

(৩৯)

কপিলবাস্তুতে জন্ম গভিরা,
জগত উদ্ধারে বৈভব তাজিরা,
ধরমের তরে আইলে চলে,
সংসারসঙ্গিনী গোপারে তুলিলে,
নিশীথে সবারে ফেলিয়া আসিলে
মায়ারজু সব কাটিয়া দিলে।

(৪০)

অসার সংসার মায়ার আগার,
কেহ নহে কার ভাবিলে কুমার,
জানমাত্র সার নিস্তার করে;
ধর্মের জনল হৃদয়ে অগিল,
নিবাত্তে তাহারে কেহ না পারিল,
চলিয়া আসিলে গাশীর তরে।

(৪১)

কে পারে এ হেন সংসারমাঝারে ?
মামুল মানব কে বলে তোমাতে ?
মহত্ত্ব তোমাতে বিরাজ করে ;
তুমি হে মানব মানব ত নও,
দেব অবতার আশ্চর্য দেখাও,
জগত তরিল তোমার তরে।

শ্রীভুবনমোহন খোষা।

৩ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জমিদারেরা এইরূপ নির্ধ্যাতন করার জয়নগর স্কুলের কর্তৃ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতে হইল।

ট্রেণিং আকাদেমিতে কিছুদিন একটিনী করা যায়। পরে হিন্দু স্কুলের ৮ম শ্রেণীর শিক্ষক হই। মেডিকেল কলেজে পাঠের সময় ব্রাহ্মসমাজের সহিত বনিষ্ঠতা হয়। এই সময়ে বিহারী ভাট্টা, R. L. Dutt প্রভৃতি মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ, বিজয় বাবু এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সহিত একত্র যোগ হয়। হিন্দু স্কুলে চাকরীর সময় দেবেজ বাবু ও কেশব বাবুর যোগে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়, দৃশ্য, দেখি। এই সময় কতকগুলি পুণ্যবজুর সহিত মিলন হয় ও বামাবোধিনী পত্রিকা প্রচার করা যায়। ১৮৬৫-৬৫ নিবোধই বিভাগের শিক্ষকতা করা যায়। স্বাধীন ভাবে শিক্ষকতা ও ধর্মপ্রচারের কার্য করিয়া যথেষ্ট গতি হয়, এই Inspiration (প্রত্যাদেশ) পাওয়া গিয়াছিল।

১৮৬৬ সালে নিবোধই হইতে রাজপুর স্কুলের ২য় শিক্ষক হইয়া আসি। তখন দ্বারকানাথ বিদ্যভূষণ মহাশয় উক্ত স্কুলের অন্ততর সম্পাদক এবং সকল কার্যের ব্যবস্থাপক ছিলেন। তিনি শিবনাথের (শাস্ত্রী মহাশয়ের) মাতুল এবং তাঁহার একবারি কদম ইতিহাস ছাপাই, এজ্ঞা তাঁহার সহিত

পরিচয় ছিল। তিনি আশ্বাস দিলেন নীত্রেই হেডমাষ্টার করিয়া দিবেন। তিনি তখন সর্বপ্রকার সংস্কারের পক্ষপাতী এবং ব্রাহ্মধর্মেরও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। প্রথমে তাঁহার বাটীতে কিছুকাল ছিলাম। সেই সময় তাঁহার ভগিনীপতি ভুবন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্ম হইবার জন্য বাগ্র হন এবং কিছুদিন উপবীত পরিত্যাগ করেন।

হেডমাষ্টার পইয়া স্কুলের অন্ততর সম্পাদক গোলক বাবুর সহিত বিদ্যভূষণ মহাশয়ের মনান্তর হওয়াতে তিনি স্কুলের সংশ্রব পরিত্যাগ করেন এবং আমিও কার্য ত্যাগ করি। পরে বিদ্যভূষণ মহাশয় हरिनाथि ইং-সং বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং আমি হেডমাষ্টার নিযুক্ত হই। এই সময় हरिनाथि-স্কুলগৃহেই আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। পূর্বে ভুবনবাবুর সহিত সময় সময় উপাসনা, সঙ্গীত ও কাহারও কাহারও বাটীতে গিয়া ধর্মকথা হইত। हरिनाथিতে অনেকগুলি উৎসাহী বন্ধু মিলিল, তন্মধ্যে কেন্দারনাথ দে সর্বপ্রধান। তিনি অনেক দিন হইতে আদি সমাজে যোগ দিয়া আসিতেছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও মধ্যে মধ্যে বাহ্যেই। তিনি কলিকাতার আফিসে কাজ করিতেন, বাটী হইতে যাতায়াত চলিত। हरिनाथির বন্ধুগণের মধ্যে হলধর

বাবু মহাবীর পক্ষপাতী ছিলেন। উমাচরণ, পূর্ণ, মহেন্দ্র, পরশুরাম প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীতাদির খুব চর্চ্চা হইত। কেদার বাবু একদিন আসিয়া প্রস্তাব করিলেন, আপনি কিছু সাহায্য করিলে আমি বাটীতে একটা ব্রাহ্মসমাজঘর নির্মাণ করি। আমি কিছু দিলাম এবং তিনি নিজ বায়ে ও পরিশ্রমে একটা গর্ভকুটার নির্মাণ করেন। প্রতাপ বাবু আসিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বান। স্কুলের ছেলেরা আমার প্রতি বড়ই অহুঙ্ক ছিল। তাহার ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিবার জন্য বড়ই বাগ্র হইল। অবিনাশ, কালীকৃষ্ণ, শ্রিয়, চন্দ্র, কেদার প্রভৃতি প্রতি খনিবার আমার সহিত কলিকাতায় যাইত, কালীনাথের বাসায় শিবকৃষ্ণ দত্তের আগ্রহে বেশ দেবা হইত। রবিবার ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিয়া আবার হরিনাম্তিতে আসা হইত।

হরিনাম্তির বাংলাকেরা আমার ইচ্ছামত সব করিতে প্রস্তুত। ইহাদিগের সহায়তায় হরিনাম্তি সমাজ বেশ জমাট হইয়া উঠিল। উপাসনাস্থলে লোক ধরিত না, আমাকেই অধিকাংশ দিন উপাসনা করিতে হইত। ছাত্রেরা বেশ সঙ্গীত করিত। ইহারা আমার এতদূর অহুঙ্ক হইত যে, কেদার বাবু এক সময় ইহাদের কয়েকটিকে লইয়া বায়াসত, নিবোধই প্রভৃতি স্থান পরিদর্শনপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। অবিনাশ ও কালীকৃষ্ণ লব কুশ আখ্যা পান। ছেলেরা জাতিভেদ ও

পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছিল—শিতা শাতাদের ক্রেশ হইবে বলিয়া উপবীত ত্যাগ করে নাই, কিন্তু অনেকে তাহাও করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাদের অভিভাবকেরা এই সকল দেখিয়া বিরক্ত হইলেও আমার প্রতি ভালবাসা এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আমার প্রতি সহায়ভূতিবশতঃ বাহ্যে কেহ কিছু বলিতেন না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্রাহ্মদের প্রতি এতদূর শ্রদ্ধা ছিল যে, রাজপুর স্কুলের সম্পাদক হরিনাম্তি স্কুলের সহিত তাহার স্কুল এক করিবার সময় কয়েকটা নিয়ম করেন, তাহার মধ্যে একটা এই যে, স্কুলে কোন ব্রাহ্ম শিক্ষক থাকিবে না। এতদুপলক্ষে গ্রামস্থ লোকদিগের একটি সভা হয়, তাহাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ব্রাহ্মশিক্ষক পাইলে অল্প শিক্ষক রাখা হইবে না। চিনু খুঁড় নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মসঙ্গীতপটু ছিলেন, তিনি সমাজে এবং আমার বাসায় আসিয়া সঙ্গীত করিতেন। প্রায় ৪ বৎসর কাল এইরূপে অবশ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও কার্য হইতে লাগিল। গৃহস্থের বাড়ীর জীলোকেরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ব্রাহ্মসঙ্গীত শুনিতে আসিতেন।

১৮৬৮ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনেকগুলি গুণবান্ যুবকের সহিত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রকাশরূপে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ইনি মজিলপুরনিবাসী, ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্মের বিষয় জানিবার জন্য সময় সময় আমার নিকট আসিতেন এবং ব্রাহ্মধর্মের পুস্তক

লইয়া বাটীতে গিয়া পড়িতেন। ইনি অতি সরল স্বভাবের বালক ছিলেন। আমি যখন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ীতে থাকি, ইনি আসিয়া এক এক শনিবার আমার সহিত বাপন করিতেন ও অনেক কথাবার্তা করিতেন এবং বামাবোধিনীর লজ্জা মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন। তখন তিনি যে ব্রাহ্মসমাজে আসিবেন, তাহার কোন সন্ধান ছিল না। তাঁহার পিতা “রাগী ঠাকুর” বলিয়া খ্যাত এবং দেশের একজন পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন। শিবনাথ পিতাকে বন্দের মত ভয় করিতেন এবং তাঁহার আজ্ঞা বিন্দুমাত্র লঙ্ঘন করিতে সাহস করিতেন না। এক সময় পিতার আজ্ঞায় তিনি ধর্ম পরীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় ও তাঁহার মাতা এই হতভাগিনী রমণীকে তাঁহাদের বাড়ীতে আনিয়া রাখেন এবং শিবনাথ আসিলে তাঁহার সহিত পুনর্মিলিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিবনাথ পিতার অগত্যাভের ভয়ে তাহাতে সন্মত হন নাই। কিছু দিন পরে পিতা তাঁহার দ্বিতীয় বার বিবাহের সন্ধ করিয়া তাঁহাকে বর সাজাইয়া বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে আনিলেন। তথা হইতে বর্তমানে গিয়া বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিবেন সজ্জ করিয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তাঁহার মাতা ও পরিজনবর্গ বিশেষরূপে বিবাহ বন্ধের চেষ্টা করিলেন। আমরাও শিবনাথকে অনেক বুঝাইলাম। তিনিও প্রস্তাবিত বিবাহের অবৈধতা স্বীকার

করিলেন, কিন্তু বলিলেন “কি রূপে পিতার হাত এড়ান যায়।” আমরা বলিলাম “তুমি পলাইয়া যাও”। তিনি বলিলেন “আজ্ঞা তাহারই চেষ্টা করিব।” কিন্তু তাঁহার পিতা বড়ই চতুর ও সতর্ক ছিলেন, তিনি রাতি না পোহাইতে পোহাইতে ছেলেকে লইয়া সরিয়া পড়িলেন। শিবনাথের অনিচ্ছা সত্ত্বে বিবাহ হইয়া গেল। ইহার পর শিবনাথ ভবানীপুরে থাকেন। তথায় মহর্ষি ব্রহ্মনিদাগর খুলিয়া নূতন তেল ও উৎসাহে ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ দিতেন। শিবনাথ তথায় গিয়া ধরা পড়িলেন। তাঁহার নির্দোষিতা ধর্মতাব শতশ্রুত প্রমাণিত হইল এবং তিনি ব্রাহ্মধর্মকেই সত্য ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই সময় যখন তিনি আমার বাড়ীতে আসিতেন আমার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে দাঁতেন এবং তাঁহার মনের কথা সকল খুলিয়া বলিতেন। সময় সময় পত্রালাপও করিতেন। এই সময় তাঁহার যে অসুস্থতা হয়, তাহা আশ্চর্য ও অস্বাভাবিক। তিনি আমাকে জানাইতেন যে, তাহার এক এক রাত্রি অশ্রুপাত করিতে করিতে অবসান হইয়াছে। এই সময় তিনি সর্বপ্রকার পাপ ও কুসংস্কার পরিত্যাগে উদ্যত হইলেন। একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, আমাদের কথা না শুনিয়া দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া বড় অশ্রয় করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

মারসী মারভীল ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

সে দিন মাডাম লিগের দোকানে প্রথম দর্শনেই মারসীর প্রতি লর্ড মারভীলের অন্তঃকরণে খতাই কেমন একটি কোমল করণার ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। বাস্তবিক মারসীর দীর্ঘ ভ্রামোশেট বর্ণের নয়ন ছুটিতে ও তাহার ঈষৎ স্নান স্কন্ধে আননে একরূপ ভাব সঞ্চার হইত যে, তাহা প্রথম দর্শনেই দর্শকের মনে রাটকাগ্রস্ত, ভূপতিত, অথচ অস্বাভাবিক গোলাপের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া একটি কল্প মহামুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিত। লর্ড মারভীল তৎপরে যখন মারসীর সহিত আলাপ করিয়া জগতে তাহার গিতুমাতৃহীন অসহায় অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় অধিকতর দয়াজ্ঞ ও সহানুভূতির ভাবব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিন হইতে যে কোন বিষয়ে মারসীকে সুখী ও সাহায্য করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি মারসীর কথা-বার্তায় বুঝিয়াছিলেন যে, এই নীনা নিঃসহায় বালিকার জীবনের এখন বেরূপ অবস্থা, তাহাতে গ্রীলোক কিম্বা পুরুষ, যে কোন ব্যক্তিই স্নেহ-পক্ষপট-ছায়া তাহার অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

মারসী মারভীল কাণ্ডের অবসানে

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যখন বাটী গমন উদ্দেশ্যে মাডাম লিগের বিপণি পরিত্যাগ করিত, ঠিক সেই সময়ে লর্ড মারভীল প্রথম দিনের সন্ধ্যাকালের জায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন, এবং প্রথম পরিচয়ের সন্ধ্যাকালের জায় প্রতি সন্ধ্যাকালেই কোন সাধারণ ভোজনাগারে তাহাকে নৈশাহারের জন্য লইয়া যাইতে লাগিলেন। লর্ড মারভীলের সযত্ন ও করুণ ব্যবহারে যুদ্ধ হইয়া তাঁহার জায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবা পুরুষের সহিত স্বাধীনভাবে মিলিত হওয়া যে সম্পূর্ণ ত্রুণীয় ও সমাজবিদ্বেষ কার্য, তাহা মারসী সে সময় সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। এইরূপে যতদিন যাইতে লাগিল, এবং যতই লর্ড মারভীলের সহিত তাহার পরিচয় গভীরতর হইতে লাগিল, ততই লর্ড মারভীলকে তাহার একজন পরম আত্মীয়ের জায় মনে হইতে লাগিল।

ক্রমে সে লর্ড মারভীলের নিকট তাহার আত্মশ্রব সমস্ত জীবনের কাহিনী বিবৃত করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। উক্তর মেরু প্রদেশে ইন্ডেস্টিগেটর নামক জাহাজের সহিত সমাবিষ্ট তাহাদের বংশের ইতিবৃত্তমূলক কাগজপত্র অবৈধবার্ণ জীবিতকালে তাহার পিতা যে তথায় গমন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া

উঠিয়াছিলেন, কথায় কথায় সে কথায় সে তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিল। তাহাদের ইতিবৃত্তমূলক কাগজপত্র আদেবণ উদ্দেশে তাহার পিতা উত্তর মেরু প্রদেশে গমন করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন ইহা শ্রবণ করিয়া, এবং উত্তরের বংশ পদবীর সাদৃশ্য দর্শন করিয়া লর্ড মারভীল সর্বদা রহস্তচ্ছলে বলিতেন “বদি উত্তর মেরু প্রদেশে সমাধিহ আশ্রমের বংশের ইতিবৃত্তমূলক কাগজ পত্র তোমার পিতা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা উত্তর মারভীল পরস্পর যে পিতৃব্য ভ্রাতা ভগিনী তাহা নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হইয়া পড়িত এবং নিশ্চয়ই একটা মহা কৌতুককর ব্যাপার সংঘটিত হইত।”

প্রথম পরিচয়ের একমাস পরে একদিন সন্ধ্যাকালে লর্ড মারভীল মারসীকে একটি কনসার্ট পার্টিতে লইয়া যাইলেন। সেখানে তিনি তাঁহার বিবাহের দিন যে সন্নিহিত হইয়া আসিয়াছে, সে সংবাদ মারসীর নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। অদ্য হইতে আমাদের মধুর বন্ধুতার শেষ হইল। আমার বিবাহের পর আপনার সহিত আর আমার সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকিবে না, ইহাতে আমি অত্যন্ত বাণিত হইতেছি। আজ হইতে আমাদের সুখময় সন্ধ্যা যাপন শেষ হইল।

সহসা লর্ড মারভীলের নিকট তাঁহার বিবাহের এই সংবাদ শ্রবণে মারসীও অনিন্দিত প্রস্তরের ছায় রক্তহীন ও

বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সে কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—

“কোন সপ্তাহে আগনার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে?” লর্ড মারভীল তাহার কথার উত্তরে বলিলেন—

“আগনী সপ্তাহে আমাদের বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে।” লর্ড মারভীলের বিবাহ-সংবাদে মারসীর বদন একপল্লব হইল যে, তাহা দর্শন করা লর্ড মারভীলের অসহ্য হইল। তিনি ভাড়াভাড়া মারসীকে লইয়া বাহিরে আগমন করিলেন। যখন তাঁহার মে মাসের উজ্জল চন্দ্রালোকবীণ লণ্ডনের রাজপথে বাহির হইলেন, তখন পথের জনতা অনেকটা মন্মীভূত হইয়াছিল। মেঘ ও কুয়াশাশূন্য আকাশে চন্দ্রের মধুর কিরণ উজ্জ্বলিত হইয়া পড়িতেছিল। বাহিরে আসিয়া লর্ড মারভীল মারসীকে তাহার বাটতে পৌছাইয়া দিবার অল্পমতি প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—

“আজ শেষ দিন, আপনাকে বাট পৌছাইয়া দিবার আনন্দ হৃদয় করিবেন কি?”

মারসী সন্মতি জানাইল। লর্ড মারভীল মারসীকে লইয়া তাহার বাটার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথে মারসী সাধারণ আবহাওয়া সন্মুখে ছু একটি কথা বাতীত আর কোনও কথা বলিতে পারিল না। তাঁহাদের মধুর বন্ধুতার ইহাই শেষ দিন, এই চিন্তা করিয়া লর্ড মারভীল অত্যন্ত বাণিত হইয়াছিলেন। তিনিও পথে কোন কথা

বলিলেন না। নীরবে মারসীকে গৃহীত
অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লণ্ডন নগরী হইতে কিয়ৎ দূরে সহর-
তলীর একটা ক্ষুদ্র ভবনে মারসী
বাস করিত। সেখানে উপস্থিত হইয়া
লর্ড মারভীল দ্বার উদ্বাটন করিলে,
মারসী বলিল “আপনাকে চা পানের জন্ত
নিমন্ত্রণ করিতেছি। আপনি কি অমুগ্রহ
করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন। অধিকন্তু
আপনাকে আমার একটি কথা বলিবার
আছে।” লর্ড মারভীল বিস্মিত হইলেন,
কারণ তিনি পূর্বে অনেক দূর
মারসীকে তাহার বাড়ীতে পৌছাইয়া
দিয়াছেন, কিন্তু মারসী তাঁহাকে কখন
চা পানের জন্ত আমন্ত্রণ করে নাই।
তিনি মারসীর নিমন্ত্রণ গ্রহণে একটু
ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন “আজ রাত্রি
অধিক হইয়াছে, গেজন্ট আমাকে ক্ষমা
করুন”। মারসী তাঁহার কথার উত্তরে
বলিল—“তাহাতে কিছুই আইসে যায়
না। আমার প্রতি আপনার করুণার জন্ত
আমি আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া
আপনাকে বিদায় দিতে পারি না”।
লর্ড মারভীল বলিলেন “আমাকে ধন্যবাদ
প্রদান করিবার কিছুই নাই। আপনি
জানেন যে, যে কয়দিন আমি আপনার
সহিত বাগন করিয়াছি, সেই কয় দিন
আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা সুখের দিন
রূপে আমার হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিবে”। লর্ড
মারভীল এই কথাগুলি বলিলেন বটে,

কিন্তু তাঁহার পাশে মারসী মারভীলের
করণ অমুরোধ একেবারে অগ্রাহ্য করা
অসম্ভব হইল। অগত্যা তিনি মারসীর
চা পানের নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্বক তাহার
বৈটকখানা গৃহে গমন করিলেন।
মারসী তাহার বৈটকখানা গৃহের গ্যাস
প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান
হইল। উজ্জ্বল গ্যাসালোক তাহার সুন্দর
বদনে প্রতিকলিত হওয়াতে তাহাকে
অতিশয় সুন্দরী দেখাইতেছিল। লর্ড
মারভীল নীরবে প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে
মারসীকে দর্শন করিতে লাগিলেন।
কণেক পরে মারসী বলিল “আপনি এত-
দিন পর্য্যন্ত আমার প্রতি যেরূপ করুণা
প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, সেজন্ত
আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার জন্য
বাগ্ন হইয়া উঠিয়াছি। ভবিষ্যতে যতই
হুঃখ কষ্টে আমি দিন যাপন করি না
কেন, আমি জীবনে যে একবার সুখী
হইয়াছিলাম, ইহা আমি কখন বিস্মৃত
হইব না। আমি বুঝিয়াছি যে, আমাদের
এই চির বিদায়ের জন্ত আপনারও অত্যন্ত
কষ্ট হইতেছে। আপনার হৃদয় অত্যন্ত
কোমল ও করুণাপূর্ণ।

আপনার নয়নেই আপনার অস্তরের
কথা আমি পাঠ করিতেছি। আপনার
মনে এই ভয় হইতেছে যে, হয়ত আপনি
আমার প্রতি এইরূপ দয়া প্রকাশ করিয়া
আমার ইষ্ট করা অপেক্ষা অধিক অনিষ্টের
সুত্রপাত করিয়াছেন। কেননা, আপনি
জানেন যে, একপ সঙ্করণ ব্যবহারে আপনি

আমার হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছেন। আপনি যখন আমাকে বলিলেন যে, আমাদের উভয়কে একত্রে পরস্পরের নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, সেইক্ষণেই আপনার অন্তরের কথা জানিতে পারিলাম। আপনি আমার প্রাণে আঘাত প্রদান করিবার ভয় করিয়াছিলেন। আপনার চিরবিদায় গ্রহণ আমার পক্ষে কি নিদারুণ ঘটনা।

তাহা এক্ষণে আর আপনার অজ্ঞাত নাই। আমার অন্তরের কাহিনী শুণ্ড রাখিয়া কেন আমি আপনাকে প্রবক্ষিত করিব। বাহ্যিক আপনি আমার জন্ত এই কারণে ত্রুণ্ডিত হইবেন না। আমার প্রতি আপনার এই রূপা আমার জীবনের একটি মহত্তম স্মৃতির কাহিনী স্বরূপ চির দিন স্মরণ রাখিব।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। দান—এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ মিঃ কেরামতহোসেন মুসলমান স্ত্রী-শিক্ষার জন্ত এক লক্ষ আশী হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

২। কুচবিহারের মহারাজকুমারীর বিবাহ—কুচবিহারের মহারাজার মধ্যমা কন্যা কুমারী প্রতিভাসুন্দরীর সহিত মিঃ লায়নেল হেনরী ম্যাণ্ডারের পুত্র বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

৩। বালিন নগরে ময়রার দোকান—জর্জবীর রাজধানী বালিন নগরে এক বাঙ্গালী যুবক গমন করিয়া সন্দেশ, রসগোল্লা, প্রভৃতি মিষ্টান্নের দোকান খুলিয়াছেন। জর্জবীর নাকি ঐ সকল দ্রব্য পবন উপায়ে বলিয়া ক্রয় করিতেছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত ময়রাগণ যদি পৃথিবীর নানা দেশে গমন

করিয়া এইরূপ মিষ্টান্নের দোকান করেন, তাহা হইলে তাহার বিদেশ হইতে প্রভূত অর্থ স্বদেশে লইয়া আসিতে পারেন।

৪। রমণী উকীল—কম গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কম রমণীগণ অতঃপর আদালতে ওকালতী করিতে পারিবেন।

৫। লণ্ডনের "ষ্টাণ্ডার্ড" নামক পত্র প্রকাশ যে তুলসি বহরোগনাশক। তুলসী পাতার রস ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক।

৬। মহম্মদের চুল—মেসিডোনিয়া প্রদেশের এক নগরের নাম ভাল্কেটিন। এই নগরের মসজিদে সুলতান ইস্লাম ধর্মপ্রচারক মহম্মদের দাড়ির একগাছি চুল দান করিয়াছেন।

৭। ভারতীয় ছাত্র—ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ছাত্রগণের সাহায্যার্থে লণ্ডন নগরে এক কমিটি আছে। সম্প্রতি এই

কমিটির প্রথম বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লেখা হইয়াছে যে, সমগ্র ইংলণ্ডে সতের শত ভারতবর্ষীয় ছাত্র অবস্থান করিতেছে। এক শতজন নগরেই এক হাজার ছাত্র আছে। অন্ততঃপক্ষে বাঁহারা দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিবেন, তাঁহারা যেন ইংলণ্ডে আর ছাত্র না পাঠান। অতঃপর এই কমিটি বলিতেছেন যে, এখানে অনেক ছাত্রই সংস্কার বটে, কিন্তু আবার কতক ছাত্র এমন যে, তাহাদিগকে এখানে না পাঠাইলেই ভাল হইত।

৮। সিগারেট বন্ধ — আমেরিকার পেন-সিলভেনিয়া প্রদেশে সিগারেট এক রূপ উঠিয়াই বাইতেছে। তথাকার স্ত্রীলোকেরা ইহার বিক্রেতাদের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন।

৯। অশোকের চিত্র—সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী যখন কলিকাতার আসিয়া-ছিনেন, সেই সময় সম্রাজ্ঞী কলিকাতার গবর্ণমেন্টে আট স্কল দেখিতে গিয়াছিলেন। তথায় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত সম্রাট অশোক, মহিষী সহ সিংহাসনে বসিয়া, সমগ্র সম্পত্তি মুক্তহস্তে দরিদ্রদিগকে দান করিতেছেন, এই চিত্রখানি দেখিয়া মহিষী বারপার নাই প্রীত হইয়াছিলেন। চিত্রখানি তাঁহাকে সুসাদরে উপহার দেওয়া হইয়াছে।

নারীশিক্ষার উপায়—শ্রদ্ধাঙ্গদীকার পি. কে. রায় মহাশয়ের পক্ষী ভারতীয়

নারীদিগের শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। ৩০০০ তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ডাক্তার অধোনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক কল্যাক শিক্ষাদান প্রণালী শিখাইবার জন্য ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছেন। তিন হাজার টাকা ব্যক্তি দিয়া এক একটা শিক্ষিতা নারীকে এই কার্য শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করা তাঁহার লক্ষ্য। এই কার্যের জন্য ৭৫ হাজার টাকা মূলধনের প্রয়োজন। এই টাকা সংগ্রহের নিমিত্ত বিলাতে শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবের কতিপয় দৃশ্য প্রদর্শন করা হইবে।

১২। ল্যাম্পের পলিতা ২৪ ঘণ্টা জ্বলিয়াই ভিজাইয়া শুকাইয়া লইলে নাকি ল্যাম্প জ্বলাইলে বেতুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহা নিবারণিত হয়।

১৩। পুরাতন সংবাদপত্র কোন পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া গোলকের দ্বারা করিলে উহা দ্বারা আগুন জ্বলাইয়া রাখা যায়। (২) চারাগাছের উপর কাগজ ঢাকা দিয়া রাখিলে উহা তুমার ও নীত হইতে রক্ষা পায়। (৩) কাগজ ভিজাইয়া কাঁচ পরিকার করা যায়। (৪) কাগজ ভিজাইয়া কার্পেট মুছিলে ধূলা বালি অপসারিত হয়। (৫) কাগজ ভাজ করিয়া কার্পেটের নীচে রাখিলে কার্পেট ভাল থাকে। পুরাতন সংবাদপত্র এইরূপ অনেক কাজেই লাগান যায়।

১৪। পুরাতন শিল্পপাত্র পরিকার

করিতে হইলে তাহাতে কতক পরিমাণে বর্ষণ করিয়া জলে দ্রব করিবে পরিষ্কার
তীব্র এমোনিয়া ঢালিয়া দিয়া ক্রম দিয়া হইয়া যায় ।

বাংলাচর্চনা ।

রাজ-অভ্যর্থনা ।

সুনীল স্নানর ওই ভারতের ভালে
উদিল গো রাঙ্গা রবি রাঙ্গিয়া গগন ।
শিশিরের শুভ্র বিন্দু গোলাপের দলে
পড়েছে যেন গো আহা মুকুতা মতন ।
পাখীর কাকলি ওই স্থলগিত তানে
গাহিল সবার আগে আগমনি প্রীতি ।
জাগিল বিমল হৃদয় সবার মনে ।
উছলি উঠিছে আজি সবার প্রীতি ।
সুদূর জলধি পারে তব বাসস্থান,
মহারাজী মনে আজি ওহে মহারাজ ।
ভারতভূমিতে হলো শুভ আগমন,
বরিতে এসেছি তাই বজবালা আজ ।

ভারত-প্রজার আজি মহাপূণ্য দিন,
হয় নাই বছরদিন এ শুভ ঘটন ।
মধুর স্বাক্ষরে ওই বাজিতেছে বীণ,
ভারতের প্রজা করে রাজদর্শন ।
এমহে সম্রাট! এস এ পবিত্র ভূমে,
রামরাজ্য হইয়াছে একদা যেখানে,
জ্ঞান ধর্ম বিভূষিত ছিল যেই ধামে,
আর্য্যপদরণু মিশি আছে যে ধূলার ।
মঙ্গল কামনা করি মোরা হেথা সবে ।
চিরপূজ্য হও তুমি ওহে ভারতের,
অক্ষয় অমর কীর্তি হোক তব ভবে ।
গাহি মোরা জয়গান সুমধুর রবে ।

কুমারী অমলা সাজাল ।

আকিঞ্চন ।

(১)

আমি রহিব অটল বৃকে ।
নিরাশ-পাথারে হলেও মগন
না হব আকুল দুখে ।
হে চিরসহায়! হে চির-আশ্রয়!
তুমি সাথী যার কিবা তার ভয়?
না থাকুক পাশে আপনার জন
তুমি ত রয়েছ বৃকে,
আমি রব সদা হাসি মুখে ।

(২)

আমি করিব তোমারে ধ্যান ।
গোপনে বিজনে, উষায় সন্ধ্যায়
খুলিয়া উদাস প্রাণ ।
তব পদতলে এ ছার, জীবন,
চির তরে দেব! করিছ অর্পণ,
সুখ, দুখ, দুই তোমারি ত দান
কেনবা হইব ম্লান?
আমি করিব তোমারে ধ্যান ।

(৩)
 আমি ভুলিব অতীত স্মৃতি
 যাহা অরি আজো কাঁদে মোর হিয়া ।
 কিবা সে করুণগীতি !
 ভুলিব আমার স্মৃতির শৈশব,
 আদর, যতন, প্রিয়জন সব,
 জীবন-উষায় লভেছিহু যাহা
 কত না গৌরবে নিতি ।

আমি ভুলিব অতীত স্মৃতি ।
 (৪)
 আমি বাঁধিব নবীনে প্রাণ,
 দূরে রেখে যত যাতনা বেদনা,
 ক্রোধ, হিংসা, অভিমান ।
 ভবের আঘাত নীরবেতে সয়ে,
 নবীন উত্তমে নব আশা লয়ে,
 বাঁধিব আমার স্তম্ভতন্ত্রী
 বাজাব নূতন তান ।
 আমি বাঁধিব নবীনে প্রাণ ।

(৫)
 আমি হাসিব কুসুম সনে ।
 ঝরবে নয়ন নীরবে গোপনে
 ছেরিয়া ব্যথিত জনে ।
 লহরের তানে নাচিবে এ প্রাণ,
 বিহগের সনে গাব তব গান,
 কলনার সনে ভ্রমিব হরষে,
 খেলিব আপন মনে ।
 আমি হাসিব কুসুম সনে ।
 আমি না চাহি কিছুই আর ।
 চাহিব আর আগে দিয়েছ সকলি,
 ধস্ত দয়া-পারাবার ।
 এ মিনতি শুধু প্রভু হে আমার,
 চিরতরে কর আমারে তোমার,
 বিবাদে, হরবে না যেও তাজিয়া
 কৃপা করি কৃপাধার ।
 আমি না চাহি কিছুই আর ।
 ত্রিহেমন্তবালা দত্ত ।

১৬৪ নং মধুরায় লেন, ইন্ডিয়ান প্রেসে শ্রীমন্মাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

৩

শ্রীমন্তোষ কুমার দত্ত কর্তৃক ৯ নং আর্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 583.

March, 1912.

“কন্যাদেবং পালনীয়া শিল্পশীয়াতিয়ত্ততঃ।”

কৃত্তাকেও পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত।

৪৯ বর্ষ।
৫৮ত সংখ্যা।

ফাল্গুন, ১৩১৮।

৯ম কল্প।
৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শোক-সংবাদ—আমরা অত্যন্ত হৃৎপের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ময়ূরভঞ্জের মহারাজা ক্রীতীরামচন্দ্র দেওভঞ্জ ১৩ই ফাল্গুন অকালে ইহলোক পরিত্যাগ-পূর্বক আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও পরিবার-বর্গকে গভীর শেফাসাগরে নিমগ্ন করিয়া, অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের তৃতীয় জামাতা। ছয় মাসের মধ্যে দুই ভগ্নীরই জীবনে মহাপরীক্ষা আসিল। ভগবান্ ঐ মর্দাহত শোকাক্ত পরিবারদ্বয়কে সাহসনা দান করুন। তিনি ভিন্ন আর কেহ এ শোকে সাহসনা দিতে পারিবে না।

শিক্ষা-বিভাগে কর্মচারি-নিয়োগ—শুনা বাইতেছে, ভারত-সচিব মিঃ রোল্যান্ডসকে ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগের

কার্যে নিযুক্ত করিয়া জব্বলপুর কলেজে পাঠাইরাছেন। ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগে শিক্ষিত ভারতবাসীদিগকে নিযুক্ত করিলেই ভারতের অধিক উন্নতির সম্ভাবনা।

বঙ্গ ও বিহারের মন্ত্রিসভা—এইরূপ শুনা বাইতেছে যে, সার উইলিয়ম ডিউক, মিঃ লায়ন ও মৌলবী সামসুল হুদা বঙ্গের, এবং মিঃ গেইট, মিঃ লেরিঞ্জ ও দ্বারবঙ্গের মহারাজা বেহারের মন্ত্রিসভার সভ্য হইবেন।

বরোদায় বালাবিবাহের হ্রাস—বরোদায় বালাবিবাহের বিকল্পে আইন আছে, তাহাতে তথায় অনেক পরিমাণে বালাবিবাহের হ্রাস হইতেছে। গত-পূর্ব বৎসর বালা-বিবাহ আইন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ১৭,৩০৬ পানা ও গত বৎসর

১,৯৩৫ খান্না মাজ আবেদনপত্র উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত নীচ সকল শ্রেণীর মধ্যেই বাল্য-বিবাহ ক্রমে ক্রমে উঠিয়া বাইতেছে। ইহাতে কল্পাদায়ে জাতি বাইবার ভয়ও দূরীভূত হইতেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা-বিল—মিঃ গোথলে প্রাথমিক শিক্ষা-বিল ব্যবস্থাপক সভায় ১৮ই মার্চ উপস্থিত করিবেন, কথা ছিল।

সরকারী গেজেট—এতদিন বাঙ্গলা, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষাতে কলিকাতা গেজেটের মর্ম প্রকাশিত হইত। শুনা আইতেছে যে, এই সকল ভাষায় লিখিত কলিকাতা গেজেট প্রকাশ রহিত হইবে।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ে দান—বাবু অনাথনাথ দেব বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে একটি ফণ্ডের জন্য ২৫০০০ টাকা ও আর একটির জন্য ৫০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ২৫০০০ টাকার সুদ হইতে একজন গ্রাজুয়েটকে আইন বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য বৃত্তি দেওয়া হইবে। ৫০০০ টাকার সুদ হইতে মোক্ষদা সুনন্দরী ও মণিনী সুনন্দরী পদক প্রদত্ত হইবে। এই দুই পদক কোন মহিলা গ্রাজুয়েটকে বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাস, জীবনচরিত কিবা কবিতা রচনার জন্য প্রদত্ত হইবে। প্রথম পদক ইতিহাস কিবা জীবনচরিত

রচনার জন্য এবং দ্বিতীয় পদক কবিতা রচনার জন্য প্রদত্ত হইবে। উত্তর রচনাতেই স্বর্ণপদক প্রদত্ত হইবে।

৮। মিঃ গোথলে—মিঃ গোথলে শিক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন, এবং শরৎকালে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতপবাদীদিগের অবস্থা দর্শন করিবার জন্য তথায় গমন করিবেন।

নূতন লাট—আগামী ১লা এপ্রেল মাজাজের গবর্নর লর্ড কারমাইকেল মিলিত বঙ্গের গবর্নরের পদ গ্রহণ করিবেন।

সম্রাট কনিকের মূর্তি—মথুরার নিকটবর্তী মটনামক গ্রামে ভূগর্ভে প্রসিদ্ধ সম্রাট কনিকের এক মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রতিমূর্তির শিরোভাগ মণ্ডিত, ইহার দক্ষিণ হস্তে রাজদণ্ড ও বাম হস্তে এক তরবারি, অঙ্গে আজুলপিত জামা, পায়ে বুটজুতা, আর পাদদেশে “রাজ-রাজেশ্বর মহারাজ কনিক” ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে পেশোয়ারে এক বৌদ্ধ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই সময়ে প্রকাশ পাইয়াছিল যে ঐ বৌদ্ধমূর্তি বৌদ্ধ নৃপতি কনিকের সময়ের। এক্ষণে সম্রাট কনিকের মূর্তিও আবিষ্কৃত হইল।